বাঙলা সাহিত্য পরিচয়

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



বাঙলা সাহিত্য পরিচয়

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রত্নসাগর গ্রন্থমালা

রত্নসাগর গ্রন্থমালা—৬

প্রথম মুদ্রণ

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৩

প্রকাশক

দেবকুমার বসু

৭জে, পণ্ডিতিয়া রোড

কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি

চারু খাঁ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ডি, সি, বোস এণ্ড কোং

৬৫বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

ব্লক

প্রভাত চন্দ্র দাস

১১/১ হরিপাল লেন

কলিকাতা-৬

মুদ্রণ

ঘোষ আর্ট প্রেস

শ্যামসুন্দর ঘোষ

১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭

পরিবেশক

গ্রন্থজগৎ, কলিকাতা

— দুই টাকা আট আনা —

বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 'রত্নসাগর গ্রন্থমালার' উদ্দেশ্য! সকলই রত্ন যাহা মন ও জীবনকে সারবান করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সুশীল মজুমদার
মনোজ ভট্টাচার্য্য
দেবকুমার বসু

শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ দত্ত আর রত্নসাগর গ্রন্থমালার কল্যাণীয় সম্পাদকগণের আগ্রহে বইখানি প্রকাশিত হল। বইটি লেখার সময়ে পূর্বাচার্যদের গবেষণালব্ধ ফল প্রয়োজন মত নিয়েছি, কোথাও ঋণ স্বীকার করি নাই। এই সুযোগে সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটিতে নতুন কথা বলার চেষ্টা করি নাই ; প্রতিষ্ঠিত তথ্য-গুলিকেই একত্রে সাজিয়েছি। বিষয়বস্তুর বিন্যাস-বৈচিত্র্যই নতুন, বইখানি বিচারের সময়ে একথা মনে রাখা দরকার।

শ্রীতারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অফ কমার্স,
কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১৩৬৩।

পিতরৌ বন্দে

বাঙলা দেশ

জাতির পরিচয় তার ইতিহাস আর সাহিত্যে। ইতিহাস দেয় তার কর্ম্মময় জীবনের বিবরণ, আর সাহিত্য দেয় তার মানসিক সাধনার রসময় রূপ। ইতিহাস দেয় তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যথাযথ পরিচয়, আর সাহিত্য দেয় তার ধ্যানালোকে উদ্ভাসিত সত্যের পরিচয়। সুতরাং কোন জাতিকে জানিতে তার ইতিহাস আর সাহিত্যের পরিচয় জানা অপরিহার্য্য।

মানুষের কর্ম্মময় জীবন গড়িয়া তুলে তার পারিপার্শ্বিক। বাইরের প্রকৃতি আর চারিপাশের অবস্থা মানুষের কর্ম্মকে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করায়। এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাব মানুষের অন্তরেও বিস্তার করে, তার চিন্তাধারা, তার ধ্যান-ধারণা, তার মনের আধ্যাত্মিক বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিকের উপর।

তাই, ইতিহাস ও সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক : কখনও ইতিহাস সৃষ্টি করে সাহিত্য, কখনও সাহিত্য সৃষ্টি করে ইতিহাস। ইতিহাসের এক-একটি যুগান্তর প্রেরণা জোগায় সাহিত্য সৃষ্টির, আবার সাহিত্য সৃষ্টি করে যুগান্তরের।

জাতির ইতিহাস আর সাহিত্য যখন এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তখন কোনও জাতিকে বুঝিতে হইলে তার ইতিহাসের সঙ্গে তার সাহিত্যকে অনুধাবন করিতে হইবে। তাই বাঙলা সাহিত্যের বিচার ইতিহাসের পটভূমিতে না করিলে তাহা কোন ক্রমেই সার্থক হইবে না।

ভারতের তথা বাঙলার জাতিতত্ত্ব আর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মিশ্রণ ভারতীয় ভাষাগুলিকে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্য দিয়াছে, এই বৈচিত্র্য অনুধাবন করিতে হইলে আগে মিশ্রণের পরিচয় লইতে হইবে।

জাতিতত্ত্ব আলোচনার ভিত্তি নৃতত্ত্ববিদ্যা। ভারতীয় জাতিসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে আমাদের নৃতত্ত্ব-বিদ্যার আশ্রয় লইতে হইবে।

একশ্রেণীর নৃতত্ত্ববিদ্ বিশ্বাস করেন যে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে ভারতের ভূ-পৃষ্ঠের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে এবং সমুদ্র হইতে হিমালয় পর্ব্বত মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। যে সকল চতুষ্পদ জন্তু সে সময়ে ভারতে বাস করিত তাহারা তখন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য সম্মুখের পা দুইটিকে হাতের মত ব্যবহার করিতে থাকে এবং কালক্রমে দ্বিপদ প্রাণীতে পরিণত হয়। এই দ্বিপদ প্রাণীই মানুষের

পূর্ব্বপুরুষ। এই মতের সম্ভাব্যতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও বস্তুপ্রমাণের অভাবে এখন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য হইয়া আছে।

অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদের মতে ভারতে মানবের আগমন হইয়াছিল বাহিরের দেশ হইতে—নরাকার বানর হইতে কোন জাতির মানবের উদ্ভব এখানে হয় নাই। বাহিরের দেশ হইতে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতে আসিয়াছে, ইহাদের মিশ্রণে ভারতীয় জাতি গঠিত হইয়াছে।

এই সকল জাতির মধ্যে যাহাদের চিহ্ন এখনও ভারতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপুরাতন হইতেছে নিগ্রোমূলোদ্ভব নিগ্রোবটু—কোন প্রাগৈতিহাসিক সময়ে ইহারা আফ্রিকা হইতে আরব ও ইরাণ হইয়া বেলুচিস্তানের উপকূল ধরিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্ব্বাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে ইহারা বাঙলা ও আসাম হইয়া মালয়, আন্দামান, প্রভৃতি দেশে ছড়ায়। ইহাদের বংশধরেরা কোন কোন দেশে অতি অল্পপরিসর স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছে, ভারতীয় ভাষায় এখন আর ইহাদের প্রভাবের চিহ্ন নাই।

তারপর ঐ প্রাগৈতিহাসিক যুগেই আসে প্রোটো—অস্ট্রালয়েডগণ। ইহারা পালেস্তাইনের পথ ধরিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সমগ্র ভারতে এবং ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশে ইহাদের বংশধরদের দেখা যায়। প্রোটো-অষ্ট্রালয়েডগণ সমগ্র উত্তর ভারত জুড়িয়া সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে উপনিবেশ স্থাপন করে। একদল নৃতত্ত্ববিদের মতে ইহারা ইন্দোচীন বা চীনের দক্ষিণ পশ্চিম হইতে আসামের পথে ব্রহ্মপুত্রের গতি আশ্রয় করিয়া ভারতে প্রবেশ করে। আর একদলের মতে ইহাদের বাস ছিল ভারতের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এবং মেসোপোটামিয়া হইয়া ইহারা ভারতে প্রবেশ করে।

যাহা হোক, এই জাতি এক বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে লইয়া যায়। সম্ভবতঃ, ইহারাই ভারতে জুম চাষের প্রবর্ত্তন করে। ইহা ছাড়া, ধান, কলা, নারিকেল, সুপারি, আদা, হলুদ, লাউ, বেগুন, প্রভৃতিরও চাষ করিত। গৃহপালিতের মধ্যে ইহাদের ছিল মুরগী। হাতীকে পোষ মানাইয়া ইহারা কাজে লাগাইত। কার্পাস হইতে সূতা কাটিয়া ইহারা কাপড় বুনিত। ইহাদের গ্রামাশ্রয়ী সভ্যতার ছাঁচ এবং মূল ভাষার শব্দ ও বৈশিষ্ট্য আর্য্য ভারতকে প্রভাবিত করিয়াছে।

আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩৫০০ শতকের পূর্ব্বে দ্রাবিড় জাতি ভারতে প্রবেশ করে। ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ছিল—এক দীর্ঘ কপাল ভূমধ্যসাগরীয়,

যাহাদের বাস ছিল দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় আর এক ছিল হ্রস্ব কপাল, যাহাদের বাস ছিল এশিয়া মাইনরে এবং যাহারা ছিল আর্মানয়েড। অবশ্য ইহাদের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় জাতিরাই প্রবল ছিল, ইহারা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে এবং সুদূর বাঙলা দেশেও ছড়াইয়া পড়ে।

ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড় জাতি ভারতে আসিয়া ইহাদের অনুবর্ত্তী সমভাষিক আর্মেনয়েডদের সহিত মিলিয়া দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে বিরাট নাগরিক সভ্যতা গড়িয়া তোলে। এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার আনুমানিক কাল খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩২৫০—২১০০ অব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সভ্যতার বিস্তৃতি যে গাঙ্গেয় প্রদেশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তাহার বস্তুপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত বস্তুগুলি হইতে সে সময়কার সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কতকগুলি মৌলিক উপাদান এই আর্য্যেতর অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

দ্রাবিড়দের পর আর্য্যগোষ্ঠি ভারতে প্রবেশ করে। আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩০০০ শতকে রুশ দেশের অন্তঃপাতী ইউরাল পর্ব্বতের দক্ষিণে ইউরোপ ও এশিয়া জুড়িয়া যে সমতল ভূমি বিদ্যমান সেখানে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের কতকগুলি উপজাতি পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ইরাণে আসে এবং ইরাণ হইতে পাঞ্জাবের পথে ভারতে প্রবেশ করে। ইহাদের সহিত আর্য্য ভাষা সর্ব্বপ্রথম ভারতে প্রবেশ করে।

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করে ; ইহাদের বিভিন্নতার চিহ্ন ভারতের প্রাচীনতম আর্য্য ভাষার মধ্যে এখনও লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান উপজাতির কথা অনুমান করা হইয়াছে—(১) নর্ডিক বা উত্তর দেশের দীর্ঘকায় শ্বেত বা গৌরবর্ণ, হিরণ্যকেশ, নীলচক্ষু, সরল নাসিক ও দীর্ঘ কপাল, এবং (২) এলপাইন বা মধ্য ইউরোপীয় লঘুদেহ, পিঙ্গল বা কৃষ্ণকেশ ও হ্রস্ব কপাল জাতি। বাঙলা দেশের আর্য্য ভাষী জনগণ এই হ্রস্বকপাল আলপীয় শ্রেণীতে পড়ে।

আর্য্যদের আগমনের ফলে আর্য্যভাষা উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করে ; প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ও দ্রাবিড় উভয়েই আর্য্য ভাষা গ্রহণ করে। এই ত্রিবিধ জাতি ও তাহাদের ভাষা মিলিত হইয়া এক নূতন জাতি ও নূতন ভাষা সৃষ্টি করে—উত্তর ভারতের (ভারতীয়) আর্য্য ভাষা-ভাষী হিন্দু।

আর্য্যদের পর ভোট-চীন ভারতে আসে। খ্রীষ্ট জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বেই চীন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের সহিত চীনের যোগ স্থাপিত হয়। আসামে ও উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গে ভোটেরা বসতি স্থাপন করিলেও আর্য্য সভ্যতার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

এইভাবে গঠিত হইয়া ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করিতে থাকে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয়।

ভারতীয় আর্য্যগণ ধীরে ধীরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে. প্রোটো অষ্ট্রালয়েড ও দ্রাবিড় গোষ্ঠির যে সকল উপজাতি আর্য্যদের সহিত মিশ্রিত হয় নাই, তাহারা এই বিস্তৃতির চাপে ক্রমশ আরও পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সরিতে থাকে। আর্য্যেতরদের প্রতি আর্য্যগণের অসীম ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছিল, আর্য্য সাহিত্যের বহু স্থানে পূর্ব্ব ও দক্ষিণের অধিবাসীদের সম্পর্কে এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত বাঙলা দেশে আসিতে আর্য্যদের যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। যতদিন তাহারা আসে নাই, ততদিন আর্য্যেতর জাতিরা বাঙলায় বাস করিত। ইহাদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং ভাষা আর্য্যদের ন্যায় ছিল না বলিয়া আর্য্যগণ ইহাদের ঘৃণা করিত। ঐতরেয় আরণ্যকে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়; সেখানে বলা হইয়াছে যে বঙ্গবাসীগণ পাখীর মত কিচির-মিচির করিয়া কথা বলে।

আর্য্য সংস্কৃতি যে বাঙলাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় আর্য্য সাহিত্যে। যে সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হয়, তখন আর্য্যগণ মিথিলা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে; কিন্তু মগধ ও বঙ্গ তখনও আর্য্যপ্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাই, তখনকার আর্য্য বিধানে যে কোন কারণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ দেশে গেলে 'পাতিত্য দোষ' হইবে এবং তার জন্য 'পুনঃসংস্কার' করিতে হইবে। বৌধায়ন তাঁর ধর্ম্মসূত্রে বিধান দিলেন যে বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি স্থানে সংকীর্ণ যোনি জাতির বাস বলিয়া সেখানে গেলে আর্য্যগণ অশুদ্ধ হইবেন, পুনরায় শুদ্ধ হইতে এক প্রকার বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অথর্ব্ব বেদ আরও অগ্রসর— জ্বর-জ্বালা, রোগ-শোককে পূর্ব্বদিগের অঙ্গ, প্রভৃতি দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে যেখানে কেঁদো কেঁদো বাঘ আছে। বলা বাহুল্য, এই বাঘ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আর্য্যদের বঙ্গদেশ অধিকারের সঠিক বিবরণ কোন ইতিহাস বা সাহিত্যে

পাওয়া যায় না বলিয়া ইহার তারিখ নির্ণয় করার কোন উপায় নাই। একটা কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহার একটা মোটামুটি সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। কথিত হয় যে বিজয় সিংহ নামক 'রাঢ়'-দেশীয় এক রাজপুত্র সিংহল জয় করিয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সিংহলের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ইহা খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। সুতরাং এই কাহিনী যদি সত্য হয় তবে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেই আর্য্যগণ বঙ্গদেশ অধিকার করেন ; কারণ বিজয় সিংহ নামটি বাঙালী নয় সম্পূর্ণরূপেই আর্য্য।

যাহা হোক, আর্য্যদের মগধ ও বঙ্গ অধিকারের পর ঐদেশের অধিবাসীরা আর্য্যদের ধর্ম্ম, রীতি-নীতি, ভাষা ও আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিলেও নিজেদের পৃথক সত্তা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দেয় নাই ; অনেকটা বিজেতাদের সহিত বিজিতের মত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। কয়েক শতাব্দী পর তাহারা আবার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল ; উত্তরাপথের উর্ব্বাঞ্চলে আর্যদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন এবং বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের মধ্য দিয়া এবং ইহারা প্রসার লাভ করে দেশের আর্য্যেতর জাতিগুলির মধ্যে। এইজন্য বহুকাল পর্য্যন্ত আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর বর্দ্ধমানের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির অল্পকাল পরে অনার্য্য শিশুনাগ বংশীয় বিম্বিসার ও অজাতশত্রু একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পর মহানন্দের পুত্র শূদ্র জাতীয় মহাপদ্ম নন্দ সিংহাসন অধিকার করিয়া নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। এই সময়ে, অর্থাৎ আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩২৭ সালে দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডার পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা তীরে উপস্থিত হন। এখানে তিনি আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত "প্রাসিই" (প্রাচ্য) এবং "গঙ্গেরিডই" (গঙ্গারাঢ়) নামে দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের কথা শুনিয়াছিলেন। নন্দগণ সিংহাসনচ্যুত হইবার পর মৌর্য্যবংশের প্রথম নরপতি চন্দ্রগুপ্ত যখন গ্রীক অধিকৃত পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন, তখন সম্ভবতঃ দক্ষিণ বঙ্গে ও দক্ষিণ কোশলে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। আলেকজেণ্ডার প্রেরিত রাজদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থানের সময়ে প্রাচ্য জগতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার যেটুকু অংশ

উদ্ধার হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় ঐ সময় গঙ্গেরিডই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল ; ইহার সহিত কলিঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ ছিল এবং ইহার পূর্ব্বসীমা ছিল গঙ্গানদী। ইহা হইতে নিশ্চিতরূপে অনুমান করা যায় যে রাঢ় ও কলিঙ্গ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল না ; মৌর্য্য সম্রাটগণ পরে কলিঙ্গকে অধিকারভুক্ত করেন। অশোকের অনুশাসনে কোথাও বঙ্গের উল্লেখ নাই ; কিন্তু তাঁহার ২য় ও ১৩শ প্রধান অনুশাসনে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের যে সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে রাঢ় ও বঙ্গ তখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষাণ সাম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল জানা যায় না।

বাঙলা দেশে বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পর্ব্বতপাত্রে যে শিলালিপি আছে তাহা হইতে জানা যায়, সিংহবর্ম্মার পুত্র চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক পুষ্করণা নগরের অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা বিষ্ণুর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে মনে করেন যে শুশুনিয়া পর্ব্বতলিপির চন্দ্রবর্ম্মাকেই সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরাজিত করেন। এলাহাবাদ দুর্গমধ্যে অবস্থিত অশোকের শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মা নামক আর্য্যাবর্ত্তের এক রাজাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করেন ; সমতট (দক্ষিণ বা পূর্ব্ব বঙ্গ), ডবাক (সম্ভবতঃ ঢাকা), কামরূপ, প্রভৃতি তাঁহাকে কর দিত। গুপ্তরাজগণের শাসনাধিকারে গৌড় বঙ্গের নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। গুপ্তগণের পতনে বঙ্গদেশের রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ; ইঁহাদের মধ্যে কর্ণসুবর্ণের রাজগণ ছিলেন প্রধান।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উত্তরাপথের পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং গৌড়বাসী আটশত বৎসর পরে পুনরায় উত্তরাপথে একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। তখন শশাঙ্ক নামে এক রাজা পূর্ব্বাঞ্চলের অন্যতম অধিপতি ছিলেন। এই শশাঙ্কের উল্লেখ বাণভট্টের হর্ষচরিতে, চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং দুইখানি খোদিত লিপিতে পাওয়া যায়। এই সকল হইতে জানা যায় যে শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন ; তাঁহার অপর নাম ছিল নরেন্দ্রগুপ্ত। ইনি গৌড় ও রাঢ় দেশ অধিকার করিয়া মগধ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন। কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত রাঙামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত হয়।

শশাঙ্ক হিন্দুধর্ম্ম পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য কিছুটা বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতনও করিয়াছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীর শেষে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়াও, মগধের গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পর আর কোন রাজা বোধহয় মগধ-গৌড়-বঙ্গে স্বীয় অধিকার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ফলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরাপথের প্রাচ্য খণ্ডে ঘোর অরাজকতা এবং মাৎস্য ন্যায় চলিতে থাকে।

খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় যে, প্রকৃতিপুঞ্জ মাৎস্য ন্যায় দূর করিবার জন্য বপ্যট নামক রণকুশল ব্যক্তির পুত্র গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। ইহা আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৭৫০ অব্দের মধ্যে ঘটে। গোপালদেব পাল বংশের প্রথম রাজা। তাঁহার রাজ্যকাল হইতে মগধ, গৌড় ও বঙ্গের পাল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস আরম্ভ হয়। পাল রাজগণ এক বিশাল বঙ্গ-রাজ্য স্থাপন করিয়া দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশাসিত করেন, আর্য্যভূমের রাজগণের প্রথা অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সাহিত্য ও শিল্পকলার সমৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। কবি ও শিল্পী তাঁহাদের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। পাল-রাজগণের আশ্রয়ে সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত নামক কাব্য রচনা করেন। পাল বংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের নাম বাঙলা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় উপাদানের অভাব। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাবে প্রাচীন পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; লৌকিক প্রসিদ্ধি বা প্রবচনে অনেক কাব্যের নাম উল্লিখিত আছে, কিন্তু তাহাদের নিদর্শন আজও পাওয়া যায় নাই।

ইহা ছাড়াও আর একটা কারণ আছে। ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন সাহিত্য ধারার সহিত যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া ফেলেন। সেই সময় অনেক পুঁথি এরূপক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়, যেখানে কখনও বর্ণজ্ঞান প্রবেশ করে নাই। কোথাও এগুলি অনাবশ্যক বিবেচনায় অনাদরে গৃহকোণে জমা হইয়াছিল, কোথাও বা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থরূপে পূজিত হইতেছিল। বাঁকুড়া জেলার এক রজক গৃহের চাল হইতে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়া বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করে। নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালায় এইভাবে বৌদ্ধ গান ও দোহার পুঁথি পাওয়া যায় এবং বাঙলা ভাষার ধারা নির্দ্ধারণে একটি অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হয়।

সুতরাং অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন উপাদান লইয়া যতই বৈজ্ঞানিকভাবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা যায়, নূতন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে অকাট্য হইলেও অভ্রান্ত বস্তু প্রমাণের অভাবে অনেক জিনিষই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না, গ্রহণ করিতেও বাধে।

তথাপি প্রচেষ্টার অন্ত নাই ; পূর্ব্বাচার্য্যগণের গবেষণা অনুগামীদের পথ সুগম করিয়াছে। একদিন বাঙলার ইতিহাস সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে বলিয়া এখন বিশ্বাস করা যায়।

বাঙলা দেশের ইতিহাসের যতটুকু আমরা পাইয়াছি, তাহাকে আর্য্যপ্রভাবিত বলা চলে। আর্য্যসভ্যতার চাপে পড়িয়া বাঙলার আর্য্য-পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবাসীদের কথা—তাহাদের জীবনযাত্রা, তাহাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম অর্ঘ্য ইতিহাসের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে এরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, বাঙলার ইতিহাস আর্য্যসভ্যতারই ইতিহাস ;—ইহাতে আর্য্যেতর উপাদান একেবারেই নাই।

বাঙলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ঐ একই কথা। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া বাঙলা ভাষার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। বাঙলা ভাষার বিষয়ে কোন আলোচনা করিতে গেলে তাঁহাকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি যে বাঙলা ভাষার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহাকে এককথায় বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে বাঙলা দেশে প্রচলিত আর্য্যপ্রাকৃতসম্ভূত কথ্য ভাষার ইতিহাস। বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত বহু শব্দের অন্বয় আর্য্য ভাষার নিরিখে করা হইয়াছে ; যেগুলির ব্যাখ্যা করা যায় নাই, কেবল সেগুলিকে দেশী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই দেশী কথাটির অর্থ, বাংলা দেশের আর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবাসীদের ভাষা হইতে গৃহিত।

তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কেবলমাত্র কয়েকটী শব্দের অবস্থিতি কোন ভাষার উপর অন্য ভাষার প্রভাব নির্দ্ধারণের গুরুতর প্রমাণ নয়। তাহা হইলে সকল আর্য্যভাষাকেই এক বলা যায়, কারণ কতকগুলি শব্দ প্রায় সকল ভাষাতেই একইরূপে প্রচলিত আছে ; সংস্কৃত মাতৃ, পিতৃ শব্দের সহিত লাতিন Meter ও Pater, গ্রীক Mater ও Pater, জার্মান Mutter (মুতর) ও Vater (ফাতর), ফরাসী Mere ও Pere শব্দের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কাজেই ভাষার বাগ্বিধি ও ব্যাকরণের বিশ্লেষণ দ্বারা এক ভাষার উপর অন্য ভাষার প্রভাব প্রমাণ করা অনাবশ্যক।

আর্য্যগণ যে ভাষা লইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্বেদের সূত্রগুলিতে। এই ভাষার নাম ছন্দস, অর্থাৎ বৈদিক কবিতার ভাষা। ঋগ্বেদের সূত্রগুলির মধ্যে একাধিক ভাষাগত বৈচিত্র্য দেখা যায় বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে যে আর্য্যগণের এদেশে আগমন একসঙ্গে হয় নাই; বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দলে তাহারা আসিয়াছিল। প্রথম দল ও দ্বিতীয় দলের আগমনের মধ্যে সময়ের এরূপ ব্যবধান ছিল যে উভয় ভাষার পার্থক্য লক্ষণীয় ভাবে ফুটিয়া উঠে এবং তাহা সূক্তগুলির মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

আর্য্যগণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতিও প্রসার লাভ করিতে থাকে। কোথাও ইহা অবলীলাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কোথাও আর্য্যেতর আদিম অধিবাসীদের প্রবল বাধায় সরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে ভারতবর্ষের ভাষা ও সংস্কৃতি দুইটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে;—উত্তর ভারতের আর্য্য-প্রভাবিত ভাষা ও সংস্কৃতি ও দক্ষিণ-ভারতের আর্য্য-প্রভাব বর্জিত দ্রাবিড় গোষ্ঠির ভাষা ও সংস্কৃতি। অবশ্য কালক্রমে আদান-প্রদানের ফলে উভয়েই উভয়কে প্রভাবিত করিয়াছে।

কিন্তু যেসব অঞ্চলে আর্য্য ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেখানের আর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী আদিম আধবাসীরা আর্য্যদের মানিয়া লইলেও সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন দেয় নাই; তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি লইয়াই আর্য্য ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত মিলিত হয়। ফলে আর্য্যভাষা ও সংস্কৃতিতে এই আর্য্যেতর জাতির অনেক বৈশিষ্ট্য মিশিয়া যায়। আর্য্যগণ এই মিশ্রণকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই; এই নবজাত ভাষাকে তাহারা প্রাকৃত অর্থাৎ ইতরজনের ভাষা বলিয়া অভিহিত করে। (অবশ্য ইহার বিকল্প অর্থও দেওয়া আছে, যথা—প্রকৃতি হইতে জাত সরল, সহজ স্বাভাবিক ভাষা) এবং এই ভাষায় যাহার কথা বলে তাহাদিগকে অন্ত্যজ অর্থাৎ হীনকুলোদ্ভব সংস্কারবর্জিত বলিয়া ঘৃণা করিতে থাকে।

এদিকে 'অনার্য্য'দের সংস্পর্শে দেবভাষা কলুষিত হইতেছে দেখিয়া এই ভাষার পবিত্রতা রক্ষার জন্য আর্য্যগণ চেষ্টা আরম্ভ করে। বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি এই ভাষাকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত করিলেন; ইহার জন্য বিবিধ নিয়ম তাঁহার "অষ্টাধ্যায়ী" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন হইতে ঐ ভাষার নাম হইল সংস্কৃত অর্থাৎ refined; ইহা শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর ভাষা। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে সমাজের অভিজাত শ্রেণী এই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু ভৃত্য প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতেছে; এমন কি অভিজাতশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা ও রাণী-মহারাণীরা প্রাকৃতেই কথা কহিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষাকে নিয়মবদ্ধ করার ফলে ইহার পবিত্রতা রক্ষা হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রসারও রুদ্ধ হইয়া যায়। ফলে, পাণিনির সময়ে ভাষা যেরূপ ছিল আজও সেইরূপ আছে।

অপর দিকে, কথ্যভাষা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে থাকে বলিয়া ইহার গতি রুদ্ধ হয় নাই ; বরং আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা নব নব রূপ লাভ করিয়াছে। কথ্যভাষার সতেজ গতি ও প্রকাশ-ক্ষমতা সংস্কৃত ভাষা পন্থীরা সহজেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং প্রয়োজন মত কথ্যভাষা হইতে শব্দ আহরণ করিয়া উহাকে সংস্কৃত শব্দের মত রূপ দিয়া নিজস্ব বলিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে [তুলনীয়—প্রাকৃত পুত্তল শব্দ যাহা শিশুগণ খেলার পুতুলকে 'পুত্র'—সম্বোধনে ব্যবহার করিত, তাহাকে 'পুত্তলিকা' রূপে সংস্কৃতে গ্রহণ করা হইয়াছে পুতুল বুঝাইতে]। অবশ্য কথ্য-ভাষার এই প্রসার তাহারা প্রীতির চক্ষে দেখে নাই ; কথ্যভাষায় শাস্ত্র গ্রন্থ রচনার বিরুদ্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া এই ভাষার জনপ্রিয়তা রোধ করিবার চেষ্টা যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দেখা যায় নাই ; কালতরঙ্গ কেহই রোধ করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আর্য্য-অধিকৃত অঞ্চলের এক একটি অংশে কথ্যভাষা সেখানকার বৈশিষ্ট্য অনুসারে এক একটি অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে, বর্ত্তমান বাঙলা ভাষা এইরূপ একটি কথ্যভাষার বংশধর। কিন্তু এখানেও সংস্কৃত ভাষাদ্ব'রা ইহার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভি-ভাবকত্বে বাঙলা ভাষা ক্রমশ দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতে থাকে ; যখনই কেহ সেই ভাষায় কথ্যভাষা হইতে শব্দ আহরণ করিয়া ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছে, সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উপহাসের পাত্র হইয়াছে। কিন্তু এখানেও সেই একই কথা ; কালতরঙ্গ রুদ্ধ হয় নাই, কথ্যভাষা জয়যুক্ত হইয়াছে। বাঙলা ভাষা সংস্কৃতের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের সম্পদরূপে আদর লাভ করিয়াছে।

প্রাকৃত ভাষাভাষী অশিক্ষিত জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের ফলে সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দ পরিবর্তিত রূপ লাভ করে ; অবশ্য এই পরিবর্ত্তন ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারেই হইয়াছে। কিন্তু ইহার সকল স্তরের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে ইহাদিগকে অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের একটি মনোজ্ঞ দৃষ্টান্ত রচনা করিয়াছেন ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাই এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল :—

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটির দুইটি লাইন আধুনিক বাঙলায় প্রকাশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

গান্ গেয়ে না' বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন (জ্যানো) মনে হয়, চিনি ওরে।

আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য যুগের বাঙলায় ইহা এইরূপ ছিল—

গান গায়া (গাইয়া) নাও বায়্যা (বাইয়া) কে
আস্তে (আইসে) পারে,
দেখ্যা (দেইখ্যা) জেন অ (জেন্হ, জেহেন)
মনে হোএ চিনী (চিন্ হীয়ে)
ও আরে (ও হারে)।

আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন বাঙলায় ইহার রূপ ছিল—

গাণ গাহিঅ নাব বাহিঅ কে
আইশই পারহি,
দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই
চিন্হি অই ওহারহি।

আনুমানিক ৮০০ খ্রীস্টাব্দের মাগধী অপভ্রংশে (মাগধী অপভ্রংশের কোনও সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই ; অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার অপভ্রংশ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এবং মাগধী প্রাকৃতের প্রসারকে সুসঙ্গতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে বলিয়া তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে ইহারও অপভ্রংশ অবস্থার কল্পনা করিয়া লইতে হইয়াছে।)

গান গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কই (কি)
আবিশই পারহি (পালহি),
দেক্খিয় জইহণ্ঁ (জইশণ্ঁ) মণহি হোই
চিণ্হিঅই ওহঅরহি (ওহঅলহি)

আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মাগধী প্রাকৃতে ইহার রূপ—

গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নাবং বাহিঅ
(বাহিত্তা) কগে (কএ, কে) আবিশদি
পালধি (পালে),
দেক্খিঅ (দেক্খিত্তা) জাদিশণং মণধি
হোদি (ভোদি) চিণ্হি অদি
অমুশ্শ কলধি (=অমুশ্শ কদে)।

আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বে আদি যুগের প্রাচ্য প্রাকৃতে সম্ভাব্য রূপ ছিল—

গাণং গাথেত্বা নাবং বংহেত্বা ককে (কে)
আবিশতি পালধি (পালে),
দেক্‌খিত্বা যাদিশং (যাদিশনং) মনধি (মনসি)
হোতি (ভাতি) চিণ্‌হিয়তি অমুশ্‌শ কতে।

আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বের বৈদিক ভাষাতে ইহার রূপ হইবে—

গানং গাথয়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা কক. (কঃ)
আবিশতি পারধি (=পারে)
দৃক্ষিত্বা (=দৃষ্ট্বা) যাদৃশম্‌ মনোধি (মনসি)
ভবতি চিহ্ন্যতে অমুষ্য কৃতে
(=অসৌ-অস্মাভির জ্ঞায়তে)।

এই পদ্ধতিতে বৈদিক ভাষা হইতে যে কোন আধুনিক ভারতীয় কথ্যভাষার প্রসারের বিভিন্ন অবস্থা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ভারতীয় আর্য্যভাষার বংশ পীঠিকা এইভাবে রচনা করা যাইতে পারে।

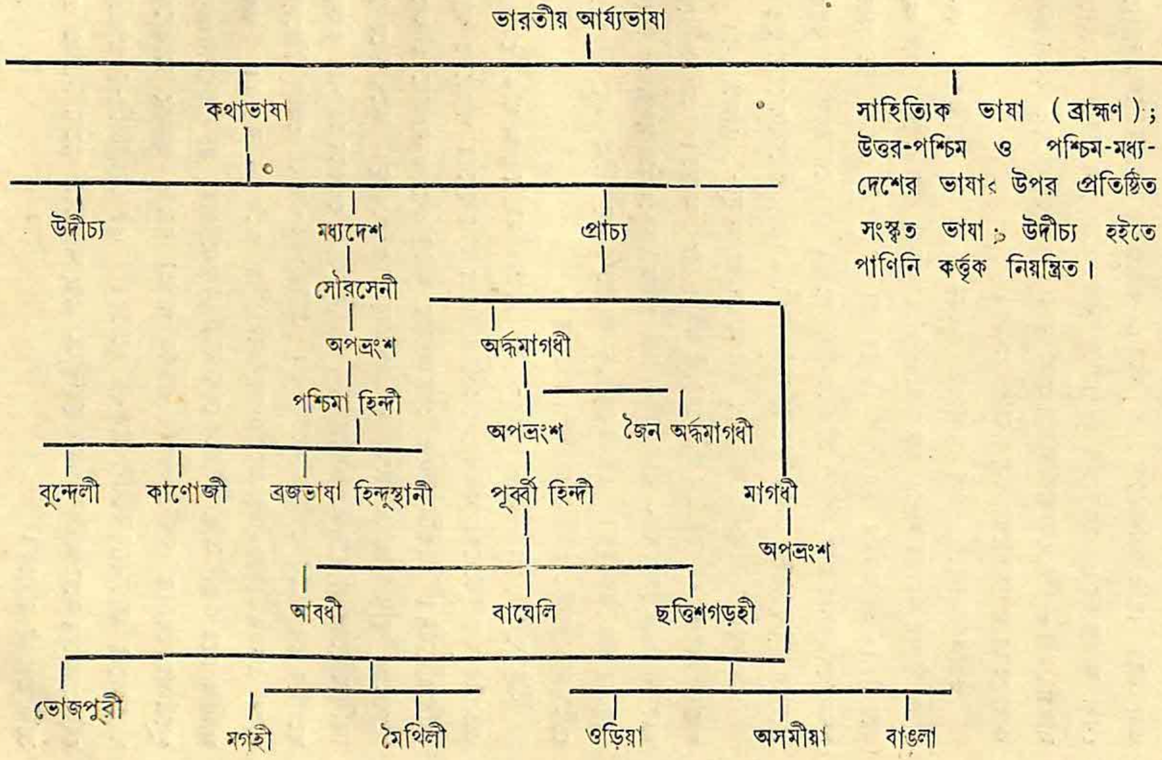
বাঙালা লিপি

কথার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশে সমর্থ হ'য়ে মানুষ অনেক দিন-ই নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে সে অনুভব ক'রলে যে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এমন অনেক বিষয় আসে যেগুলি তার স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সকলের স্মৃতি-শক্তি সমান নয়; অনেকেই কোনও কিছু বেশি দিন মনে রাখতে পারে না। তাই স্মৃতির উপর নির্ভর করে আমাদের অনেক সময়েই ঠকতে হয়। এজন্য মানুষ এমন একটা কিছু উপায় বার করার চিন্তায় মন দিল যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য নিজের মনে রাখা যায় এবং ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের অবগতির জন্য রেখে যাওয়া যায়। মানুষের অভাব-বোধ-ই আবিষ্কারের জনক বলে ইংরাজিতে প্রবাদ-বাক্য আছে। মানুষের এই অভাব পূরণের জন্যই মানুষের দ্বারা লিপি-কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে।

মানুষ যেমন একদিনে অতি সহজেই কথার সাহায্যে ভাব প্রকাশ করতে সমর্থ হয় নি, সেইরূপ একদিনেই অক্ষরের সাহায্যে মনের কথা লিপিবদ্ধ করতে পারেনি; আরম্ভ এবং সূচনা অতি স্থূল আকারেই হয়েছিল।

মানুষের লেখার প্রথম প্রয়াস চিত্রের আকারে প্রকাশ পায়। কতকগুলি স্থূল দ্রব্যের অথবা প্রাণীর ছবি দেয়ালের গায়ে অথবা পাথরের উপর কুঁদে মানুষ

[আর্য্য-ভাষার বংশপীঠিকা]



লিখতে শিখেছিল। কিছুদিন এ দিয়েই বেশ কাজ চলতে থাকে, কিন্তু এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করে মানুষ বেশিদিন খুশি থাকতে পারে নি। এই উপায়ে সে তার মনের সব কথা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে না পারায় এর চেয়ে সহজ এবং উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলে প্রতীকের সাহায্যে লেখা আরম্ভ হয়। কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় ও প্রত্যেক মানুষের ব্যবহারের সামগ্রী, যথা—তীর, কোদাল, লাঙ্গল প্রভৃতির প্রতীক কাজে লাগে; যেমন খনন-কার্য্য বোঝাতে কোদালের চিত্র ব্যবহার সুরু হয়।

প্রতীক সাহায্যে ভাব প্রকাশের অনেকটা সুবিধা হয়েছিল। যেমন, হরিণ শীকার করা বোঝাবার জন্য হরিণের গায়ে একটা তীর এঁকে দিলেই কাজ হয়ে যায়। এই জাতীয় চিত্র-লিপি বিশেষভাবে প্রসারিত এবং পরিণত করেই চীন দেশে লেখার কাজ এখনও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। সেখানে 'দরজা বন্ধ আছে', 'বাগানে ফুল ফুটেছে', অথবা 'সূর্য উঠেছে', কেবল একটি চিত্র-রেখায় লেখা যায়।

এই প্রতীক চিত্র-লিপির গৌণ ফল আরও অনেক দূর-ই এগিয়েছিল। এই পদ্ধতি থেকেই মানুষের মনে বর্ণমালা সৃষ্টি করার ধারণা জন্মায়। প্রতীক-চিত্রের সাহায্যে কার্য বুঝান যায়, তখন প্রতীকদ্বারা শব্দও তো বোঝান সম্ভব, এই বিশ্বাস মানুষের মনে উদয় হয়। এই বিশ্বাসবশে বহুদিনের বহু পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আমাদের বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে।

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতকে ভারত-সম্রাট ধর্মপ্রাণ মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধদেবের কতকগুলি বাণী ও নির্দেশ নানা স্থানের পাহাড়ের গায়ে লিখিয়েছিলেন। সেগুলি আজও সেই অবস্থায় আছে এবং জনসাধারণের কাছে অশোকের স্মৃতি আর বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচয় অমর করে রেখেছে। অশোক যে কি লিখিয়েছিলেন তা অনেকদিন পর্যন্ত জানা যায় নি, কারণ সেখানে যে লিপি ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলিকে কেউ চিনতেন না। খ্রীষ্টীয় ১৮৩৭ সালে জেমস্ প্রিন্সেপ্ নামে একজন ইংরাজ এই অশোক-অনুশাসনগুলির পাঠোদ্ধার করেন। তখন জানা যায় যে ওগুলি ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা হয়েছিল এবং যেহেতু এই অনুশাসনগুলির পূর্ব্বেকার কোনও লেখার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়নি, সুতরাং ব্রাহ্মীকেই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বর্ণমালা বলে ধরা হয়েছে। এই ব্রাহ্মীলিপি-ই ভারতীয় বর্ণমালাসমূহের মধ্যে অধিকাংশের মাতৃস্থানীয়া, এবং আমাদের বাঙলা লিপিও এই ব্রাহ্মী থেকেই এসেছে।

ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে দু'রকম মত আছে—(১) ফিনীশিয়া দেশের লিপির ছাঁচে ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই লিপি গঠন করেন।

(২) মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মুদ্রা বা শীল-মোহরে যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তা সম্ভবতঃ কোন অনার্য ভাষায় লিখিত; এই চার হাজার বছরের প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি। তবে এই ভারতীয় প্রাচীন অনার্য লিপি থেকেও প্রাচীন ভারতীয় আর্য লিপির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়।

ব্রাহ্মী লিপির গঠনপ্রণালী সরল, এর বর্ণগুলির মাথায় কোনও মাত্রা-রেখা নাই। এগুলিকে গঠনের দিক দিয়ে বিচার করলে ভাস্কর্য-শিল্পের-ই অন্তর্গত বলা যেতে পারে; যেন কতকগুলি আলাদা আলাদা নক্সা আঁকা হয়েছে।

ব্রাহ্মী একদিনেই ভারতের একমাত্র লিপিতে পরিণত হয়নি; একে অনেক দিন ধরে অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই যেতে হ'য়েছে। রাজা অশোকের সময়েই ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পারস্যের একিমেনিয়ান সাম্রাজ্যে প্রচলিত খরোষ্ঠী নামক সেমিটিক লিপি ব্যবহৃত হ'য়েছিল; কিন্তু দেশের রাজা ব্রাহ্মীকে গ্রহণ করায় এটা ক্রমশঃ লোপ পায়।

কুষাণদিগের রাজত্বকালে ব্রাহ্মী লিপির গঠনে সামান্য একটু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর এগুলি ছিল চওড়া অপেক্ষা লম্বাই বেশি। গুপ্ত রাজবংশের সময়ে ব্রাহ্মী লম্বা ও চওড়ায় সমান দাঁড়ায় এবং প্রত্যেক অক্ষরের মাথায় মাত্রার মত রেখা দেখা যায়।

যতই দিন যায়, ব্রাহ্মী লিপিও লেখার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন সাধন করে। এই পরিবর্ত্তন আবার দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়েছিল। এই জন্য খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মী লিপির পার্থক্য দেখলে ধারণা করা খুবই কঠিন হ'ত যে দুটিই একই লিপির পরিণতি। এই সময়ে ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন চীন এবং জাপানে প্রচুর পাওয়া যায়। সেখানকার প্যাগোডা প্রভৃতি ধর্ম্মমন্দির এই লিপিতে লেখা সংস্কৃত মন্ত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে।

সম্রাট হর্ষবর্ধন ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। এর পর উত্তর ভারতে কিছুদিন ধরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন চলেছিল। এই সময়ে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবে যেমন একদিকে সামাজিক ঐক্যের অভাব দেখা দিয়েছিল, তেমনই লিপিও ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক রাজ্যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। খ্রীষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক লিপি উত্তর ভারতে প্রচলিত হ'য়েছিল:—

(১) শ্রীহর্ষলিপি—গুজরাট, রাজপুতানা এবং যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাংশে প্রচলিত।

(২) শারদালিপি—পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে প্রচলিত।

(৩) কুটিললিপি—যুক্তপ্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলে, বিহারে, বাঙলায় এবং উড়িষ্যায় প্রচলিত।

এই তিন জাতীয় লিপি থেকেই আধুনিক উত্তর ভারতীয় লিপিগুলির জন্ম হয়েছে। শ্রীহর্ষ থেকেই দেবনাগরী লিপির উৎপত্তি। এই লিপি এখন সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বাধিক প্রচলিত এবং ইহাকেই ভারতীয় রাষ্ট্রভাষার বাহনরূপে ব্যবহার করবার প্রস্তাব হয়েছে। এই লিপি রাজপুত জাতিও গ্রহণ করেছিল এবং হিন্দুযুগে রাজপুতেরাই ভারতের ইতিহাস উজ্জ্বল করে। সেই সময় থেকেই হিন্দুর জীবনের সঙ্গে এই লিপি অচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছে।

শারদা লিপির সঙ্গে দেবনাগরীর প্রভাব যুক্ত হয়ে পাঞ্জাবের গুরমুখী লিপি সৃষ্টি করেছে।

কুটিল লিপি থেকে নেপালের নেওয়ারী ও মৈথিল-বঙ্গ লিপি এসেছে। মৈথিল ও বাঙলা গত তিন শতাব্দীর মধ্যে আলাদা হয়েছে। বাঙলা লিপি থেকে আবার অসমীয়া ও উড়িয়া লিপির উদ্ভব। অসমীয়ার সঙ্গে বাঙলা লিপির খুব পার্থক্য নাই। কিন্তু উড়িয়া লিপির আকৃতি দেখলে বাঙলা লিপির সঙ্গে এর সম্বন্ধ পাওয়া কঠিন। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে বাঙলায় যা দ্বারা লেখা হয় তার মুখটি সরু এবং কোণ-বিশিষ্ট; এই জন্য বাঙলা লিপির কোণগুলিও সরু। উড়িষ্যায় যা দিয়ে লেখা হয় তার মুখটি মোটা এবং কোণ নাই; এই জন্য উড়িয়া লিপি গোলাকার। এমন কি অক্ষরের মাথায় মাত্রাগুলিও গোল না করলে লেখা যায় না। লিপির পরিবর্ত্তনচিত্র দেখলে এই রূপান্তর অনেকটা বুঝা যাবে।

মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে বাঙলাভাষায় লেখা প্রাচীনতম পুস্তক লইয়া আসেন, ইহা 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। এগুলি খ্রীষ্টীয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

চর্য্যাকারগণের মধ্যে সিদ্ধাচার্য লুইপা বা লুহিপাদ আদি সিদ্ধা নামে খ্যাত। তিনি অতীশ বা দীপঙ্করের সমসাময়িক এবং দুজনে একত্রে 'অভিষময়-বিভঙ্গ' নামক বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন। অতীশ ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বতে যান। কাজেই, বৌদ্ধগানগুলির রচনার প্রাচীনতম কাল ১০ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধরা যায়। আবার কৃষ্ণাচার্যের বা কাহ্নপাদের পদ আছে; তাঁহার নামও অনেক স্থলেই পাওয়া গিয়াছে। সকল কৃষ্ণাচার্যই এক ব্যক্তি কিনা সন্দেহ। তবে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে "হে বজ্র-পঞ্জিকা যোগরত্নমালা" নামক পুস্তকখানিতে যে রচয়িতার নাম পণ্ডিতাচার্য শ্রীকাহ্নপাদ বলিয়া পাওয়া যায়,

তাহাই চর্যারচয়িতার নাম বলিয়া মনে হয়। এই পুস্তক মগধের রাজা গোবিন্দপালের ৩৯ বৎসর বয়সের সময়ে লিখিত। ইহা ঠিক হইলে উহাকে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং চর্যাকার কৃষ্ণাচার্যপাদকেও আমরা ১২ শতাব্দীর শেষভাগে ফেলিতে পারি। এই বিচারে চর্যাপদগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকের ২য় ভাগ হইতে ১২শ শতকের শেষভাগের মধ্যে ফেলা যাইতে পারে। এই সময়ে বাঙলার রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। এই পুস্তকখানিও বৌদ্ধ সহজিয়াদের গ্রন্থ।

এই পুস্তকের মাত্র এক তৃতীয়াংশ বাঙলাভাষায় লেখা। কিন্তু এই ভাষা লইয়া কিছু কিছু মতভেদ দেখা যায়। গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় যেমন একটা যৌগিক পন্থার গূঢ় রহস্য, ভাষাটিও তেমনি রহস্যাবৃত। অনেকে ইহার নাম দিয়াছেন 'সন্ধ্যা ভাষা'; অর্থাৎ ইহা সন্ধ্যার ন্যায় আলো-আঁধারি—কিছু বুঝা যায়, কিছু যায় না। বাস্তবিক পক্ষে, অনেক সময়ে ইহাদের বাহ্যিক রূপের মধ্যে বিশেষ সঙ্গত কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু গুহ্য অর্থ ধরিতে পারিলে সাধন-বিষয়ক নানা তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। অনেকে বলেন ভাষাটি সন্ধা অর্থাৎ Intentional language।

অনেকে আবার ইহাদের মোটেই বাঙলাভাষা বলিয়া স্বীকার করেন না। কেহ কেহ ইহাদের প্রাকৃত, অপভ্রংশ, প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন; কেহ কেহ এগুলিকে আবার পশ্চিম-মাগধীর লক্ষণাক্রান্ত এবং পশ্চিম-মাগধীর বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষা-গুলিরই আদিরূপ বলেন। কিন্তু ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে এই পদগুলির ব্যাকরণ, মধ্য-বাঙলা এবং বর্ত্তমান-বাঙলার সহিত ইহার ক্রম বিবর্ত্তনের নিয়মিত এবং সুস্পষ্ট সংযোগ দেখিয়া ইহাদের প্রাচীন বাঙলারই খাঁটি নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

সুনীতিবাবুর মতে চর্যাপদের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভাষার খাঁটি নিদর্শন। তবে ৯ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের প্রভাবে শৌরসেনী অপভ্রংশ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল,—ইহারই ফলে দোহাপদের ভাষার উপরেও মাঝে মাঝে শৌরসেনীর প্রভাব দেখা যায় এবং কখনও কখনও মধ্যযুগের সাহিত্যিক প্রাকৃতেরও প্রভাব লক্ষিত হয়।

দোহাগুলি পড়িলে মনে হয় যে বাঙলাভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহারের এই বোধ হয় প্রথম প্রয়াস। সেইজন্য দোহা-রচয়িতাদেরও স্বীয় ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল না। একটু অসুবিধা বোধ করিলেই তাঁহারা প্রাকৃত, সংস্কৃত অথবা শৌরসেনী অপভ্রংশের সাহায্য লইয়াছেন। পদগুলির স্থানে স্থানে এমন

দু'একটি শব্দ পাওয়া যায় যাহা অর্থের সুস্পষ্টতা অথবা ছন্দের নিয়ম ভঙ্গ করে; অথচ সেখানে খাঁটি বাঙলা প্রতিশব্দটি দিলে উভয়ই বজায় থাকে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে এগুলিকে খাঁটি বাঙলায় লেখা বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

দোহাগুলির মধ্যে কয়েকটি পংক্তি আছে যাহা বাঙলা সাহিত্যে অতি সুপরিচিত প্রবাদবাক্য রূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।
(হরিণ নিজ মাংসের জন্য নিজেরই শত্রু)
রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাই
(গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়)।
দুহিল দুধ কি বেণ্ট সামাঙ্গ
(দোহন করা দুধ কি গরুর বাঁটে প্রবেশ করে?)

বৌদ্ধগান ও দোহার মধ্যে চর্যাচর্য-বিনিশ্চয় নামক অংশের অন্তর্গত পদগুলি বাঙালাভাষায় রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস কেবলমাত্র রচনার নমুনা লইয়া রচিত হইতে পারে না। রসের দিক দিয়া বিচার করিলে চর্যাচর্যের অন্তর্গত পদগুলি বাদ দিতে হয়; ইহাদের সকলগুলির মধ্যে যোগের গূহ্যতত্ত্বসমূহ সঙ্কেতের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। ইহারা রসসৃষ্টির ধার ধারে না। কাজেই ইহাদের সহিত পরবর্তী সাহিত্যের কোনও যোগ-সম্বন্ধ নাই; ইহারা এই ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে ইহাদের মধ্যে কয়েকটি সম্পূর্ণ অস্বেচ্ছাকৃত শব্দবিন্যাস ও ছন্দ প্রকরণের দ্বারা সাহিত্যের পর্যায়ে উঠিয়াছে, এমন কি দু'একটির মধ্যে গীতি-কবিতার সুর যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা অনুভব করা যায়। আমরা এইরূপ দু'একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি; বুঝিবার সুবিধার জন্য সরল বাঙলা অর্থও দেওয়া হইল :—

রাগ মালসী গবুড়া।
জো মণ গোএর আলা জালা।
আগম পোথী ইষ্টা মালা ।।ধ্রু।।
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায়।
কাঅবাক্‌চিঅ জুসু ণ সমায় ।।ধ্রু।।
আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস ।।ধ্রু।।

জে তই বোলী তে ত বিটাল।
গুরু বোবসে সীসা কাল ॥ধ্রু॥

[আগম, জপমালা প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞান মনের গোচর; কিন্তু সহজ পথ (সহজিয়া মত) কিরূপে বলা যায়, কারণ ইহারা কায়বাক্ চিত্তের অগোচর। গুরু বৃথাই শিষ্যকে এ বিষয়ে উপদেশ দেন; ইহা বাক্‌পথাতীত, ব্যক্ত করা যায় না। গুরু যাহা বলেন তাহা বোবার বর্ণনার মত অস্পষ্ট, এবং শিষ্য যাহা বুঝে তাহা কালার অসম্পূর্ণভাবে শুনার মত।]

রাগমল্লারী

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আসা বহল পাত ফলাহা (হ বাহা) ॥ধ্রু॥
বরগুরু বঅণে কুঠারেঁ ছিজয়
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥ধ্রু॥
বাটই সো তরু সুভাসুভ পাণী
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥ধ্রু॥
জো তরু ছেব ভেবউ ন জাণই
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥ধ্রু॥
সুন তরু গঅণ কুঠার
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥ধ্রু॥

[মন তরুর ন্যায়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা, আশা তাহার বহুল পাতা এবং ফলস্বরূপ।

কাহ্ন বলে যে বজ্র গুরুর বচনরূপ কুঠারে ছিন্ন ক'রিলে সেই তরু পুনরায় উৎপন্ন হয় না।

সেই তরু শুভাশুভ জলে বর্ধিত হয়। বিদ্বজ্জন গুরুর বচন অনুসারে তাহাকে ছেদন করেন।

যাহারা এই বৃক্ষের ছেদন-ভেদন জানে না তাহারা ভব অর্থাৎ সংসারকে গ্রহণ করিয়া উচ্চ সাধন হইতে সরিয়া পড়ে।

শূন্য (অবিদ্যা) তরুকে গগন (প্রভাস্বর) কুঠার দ্বারা ছেদন কর, যাহাতে ইহার ডাল মূল আর বাহির না হয়।]

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥ধ্রু॥
অম্হে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই

জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ধ্রু॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো ॥ধ্রু॥
জাএথু জাম মরণ বিসঙ্কা
সো করউ রস রসাণেরে কংখা ॥ধ্রু॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ॥ধ্রু॥
জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সোধাম ॥ধ্রু॥

[লোক মিথ্যা আপনার মনে ভব ও নির্ব্বাণ রচনাদ্বারা আপনাকে বদ্ধ করিতেছে। আমরা অচিন্ত্যযোগী, কিন্তু জানি না, জন্ম মৃত্যু এবং ভব কিরূপে হয়। জন্মও যেমন, মৃত্যুও তেমনি, জীবন ও মরণে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; এ ভবে যাহার জন্ম ও মরণের শঙ্কা আছে, সে রস ও রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগীরা সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পারে না। পদকর্তা সরহ বলে, জন্ম হইতে কর্ম না কর্ম হইতেই জন্ম, সে কথা স্থির করা যোগীদের পক্ষেও অচিন্তনীয়।]

মঙ্গল কাব্য

যে চপল নদী পার হয়ে এল গিরি-বন-প্রান্তর,
কথনো আলোকে, কথনো অন্ধকারে,
থমকি দাঁড়ায়ে সহসা সে যদি চাহিত পিছন ফিরে,
হিমালয়-শিরে পেত কি দেখিতে কোথায় উৎস তার ?

*　　*　　*　　*

নদীর উৎপত্তি-স্থল অনুসন্ধান এবং আবিষ্কার করিতে গেলে আমাদের অধিকাংশ সময়েই হতাশ হইতে হয়। যে বিরাট জলরাশি বিপুল বেগে দুই কূল প্লাবিত করিয়া সাগরাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার উৎস পর্বতের বুকে গবাক্ষের ন্যায় ক্ষুদ্র কুণ্ড-বিশেষ, একথা বিশ্বাস করা যায় না। তাই উৎপত্তি-স্থল বা উৎসের দ্বারা নদীর কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। নদীর পরিচয় তাহার গন্তব্য-পথে, তাহার স্রোতোধারায় খুঁজিতে হইবে, তাহার উৎসে নহে।

নদীর পরিচয় যেমন তাহার উৎসে পাওয়া যায় না, কোনও সাহিত্যের পরিচয়ও সেইরূপ তাহার উৎপত্তি-স্থলে নাই। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যই কোন-না-কোন ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিৎকর মূল হইতে উঠিয়াছে। তারপর ইহার প্রবহমান ধারা ইহাকে এরূপভাবে চালিত করিয়াছে যে মূলের সহিত ইহার সম্বন্ধ বাহির করিতে হইলে রীতিমত গবেষণার প্রয়োজন হইবে। তাই, সকল সময়ে কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তাহার মূল উৎসের অনুসন্ধান করা লাভজনক নহে; অনেক সময়েই ইহা নিতান্ত নিস্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইবার বহুপূর্বেই অন্যান্য দেশের সাহিত্য-ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। এই সকল ইতিহাস-সঙ্কলনকারীদিগের চেষ্টা ও পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞান আমরা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়োগ করিলে লাভবান হইব সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-ইতিহাস তুলনামূলকভাবে পাঠ করিলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে সকল দেশের সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রাথমিক অবস্থায় যখন মানুষের মনে আত্ম-প্রকাশের চিন্তা সবেমাত্র জাগিয়াছে তখন সে জীবনের স্থূলতম অনুভূতিগুলিকে লইয়াই কাব্যরচনার প্রয়াস করিত। এই অনুভূতিগুলি হইতেছে ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, বীরত্ব, প্রেম প্রভৃতি।

অনুভূতিগুলি স্থূল বলিয়া বর্ণিত বিষয়ও সরল ও সোজাসুজি ছিল; ইহাতে জীবনের প্রকৃত রূপটিকেই গ্রহণ করা হইত, কোন ভাবাদর্শ দেখাইবার চেষ্টা ছিল না। সাহিত্যের এইরূপ প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে ইংরাজি সাহিত্যে ব্যালাড (Ballad) বলা হইয়াছে। সে দেশীয় সমালোচকগণ মহাকাব্যকে যেরূপ Authentic ও Literary রূপে ভাগ করিয়া কাজের সুবিধা করিয়াছেন, আমরাও ব্যালাডকে গীতিকা বলিয়া তাহাদের প্রামাণিক ও সাহিত্যিকরূপে ভাগ করিতে চাই।

যেগুলি প্রাচীনকালে প্রাচীন ভাবধারা লইয়া প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত হইয়াছিল, তাহারাই প্রামাণিক এবং যেগুলি আধুনিককালে আধুনিক মনোভাব লইয়া প্রাচীন ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত তাহারাই সাহিত্যিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃত্তিবাসের রামায়ণকে প্রামাণিক এবং মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ-বধকে সাহিত্যিক বলিতে হইবে।

প্রাকৃতিক আবহাওয়ার জন্য আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেইজন্য অনেক সময়ে আমাদের জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, প্রবাদ প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয়। বলা বাহুল্য, এইপথে চলিতে ভুল হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

তথাপি, প্রাচীন অন্ধকার যুগ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে এরূপভাবেই অগ্রসর হইতে হইবে; ইহা ছাড়া আর গতি নাই।

বাঙলা সাহিত্যের মূল উৎস কোথায়; ইহার গোড়াপত্তন ঐরূপ প্রাচীন ও প্রামাণিক গীতিকা দ্বারা হইয়াছিল কিনা, ইহা নির্ধারণ করিতে হইলে বাঙলা সাহিত্যের প্রধান ভাবধারা কি তাহাই সর্বপ্রথম বুঝিতে হইবে। প্রচলিত ভাবধারার সহিত আদিরূপের স্বাভাবিক ঐক্য থাকাই সম্ভব।

ভারতবর্ষের সকল ভাষাতেই যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, তাহা কোন-না-কোন ধর্মসম্প্রদায়ের চেষ্টা দ্বারা সাধিত। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ধর্মতত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্যের ব্যাখ্যা; সহজে ইহাদের সাহিত্য পর্যায়ে ফেলা কঠিন। কাজেই, ভারতীয় সাহিত্যের মূলে রহিয়াছে ধর্মমত প্রচার; ধর্মই ইহার কেন্দ্রস্থল। বাঙলা সাহিত্যের মূলেও এই ধর্মভাব প্রবল; তবে বাঙালী কবি ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়বস্তুকে রোমাঞ্চকর করিয়া তুলিতে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকে জনপ্রিয় করিবার জন্য যে সকল উপ-বস্তুর সন্নিবেশ করিয়াছেন সেগুলিকে কোনও ধর্মসম্প্রদায়ই ভাল বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

হিন্দুদের যাবতীয় তথ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ-সমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় রচিত সাহিত্যের মূল সেইজন্য আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। হিন্দুদের যে সকল দেবদেবীর কথা সংস্কৃত শাস্ত্রাদি গ্রন্থে লিখিত, তাঁহাদের লইয়াই বাংলা সাহিত্যের জন্ম। কিন্তু এখানে একটি কথা আছে—বৌদ্ধ-ধর্মের পতনের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে পুনরাবির্ভাব হয়, তাহার পরে বাঙলা দেশে সাহিত্যসৃষ্টি আরব্ধ হইয়াছে। সেই সময়ে বাঙলা দেশে যে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, তাহা হিন্দু সমাজের মধ্যেই কতক পরিমাণে আত্মগোপন করিয়াছিল। তাই, বৌদ্ধ মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হিন্দু দেবদেবীর রূপ বদল করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্রে বর্ণিত দেবদেবীর সহিত হিন্দু দেবদেবীর অনেক পার্থক্য দেখা দিয়াছে।

হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। এই শাস্ত্রপাঠে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অধিকার ছিল না। তাই জনসাধারণের নিকট বৈদিক ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাচীন ও পুরাতন আখ্যায়িকা এবং ঐতিহ্য সংগ্রহ করিয়া পুরাণগ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল। জনসাধারণের শিক্ষা এবং মনোরঞ্জনের জন্য পুরাণ রচিত হইয়াছিল বলিয়া পুরাণকে ধর্মবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিতে হইয়াছিল। তাই পরবর্তী কালে পুরাণের রূপ পরিবর্তিত হইয়া রূপক ও অলৌকিক ঘটনাদ্বারা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত

হয়। এই পুরাণগ্রন্থ সমূহের বহুল প্রচার ছিল। তাই বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি-স্থল বলিতে আমাদের পুরাণকেই বুঝিতে হয়।

কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে—পুরাণে দেবদেবীর বর্ণনা যে ভাবে রহিয়াছে. বাঙলা সাহিত্যে ঠিক সে ভাবে নাই ; বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ইহার মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে জনসাধারণের কল্পনাশক্তি ; যুগে যুগে সংশোধন ও সংযোজনের ফলে শাস্ত্রীয় দেবদেবী লৌকিক আকার ধারণ করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই একদিনে হয় নাই।

কি রকম করিয়া এই রূপান্তর সাধিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় না, সকল দেবদেবীর কাহিনীর উপযুক্ত প্রমাণও পাওয়া যায় না। সামান্য দু' একটি কাহিনীর খণ্ড খণ্ড, অসংলগ্ন প্রমাণের সাহায্যে আমাদের অবশিষ্ট অংশটি অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

যে সকল দেবদেবীর কাহিনী বাঙলা সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শিব, চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর, কালী, অন্নদা, কৃষ্ণ, শীতলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে বহু কবি বহু ভাবেই শ্রম করিয়াছেন। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে অনেকের কথাই কোনও শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই ; তাঁহাদের লৌকিক আখ্যায় অভিহিত করা ছাড়া উপায় নাই। নানা কারণে শিবকেই ভারতের প্রাচীনতম দেবতা বলিয়া নির্ধারিত করা হইয়াছে। কাজেই, শিবের মাহাত্ম্য যে সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের প্রাচীনতম বলা যাইতে পারে। শিবের মাহাত্ম্য প্রচারে খুব বেশি সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই সত্য, কিন্তু প্রায় সকল কাব্যের মধ্যেই কোন না কোন প্রসঙ্গক্রমে শিবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ; ইহাতে অবশ্যই শিবের জনপ্রিয়তা সূচিত হইতেছে। এই দেবতাটিকে লইয়া নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ চলিত। শিবকে লইয়া রচিত কাব্যের মধ্যে রামেশ্বরের শিবনারায়ণই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ; ইহা আকারে যেমন বৃহৎ, তেমনিই সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষজজ্ঞ প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামেশ্বরই যে গ্রন্থের সমুদয় রচনা করিয়াছিলেন, একথা জোর করিয়া বলা যায় না ; হয়তো বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবি ইহাতে সংযোজন কার্য করিয়াছেন। কিন্তু রামেশ্বরের পূর্বে কোনও শিবায়ন ছিল কিনা, অথবা কিরূপ ছিল তাহা জানা যায় না। তবে রামেশ্বরের আদর্শ কি ছিল এবং কাহিনীর মূল কোথায় প্রশ্ন করিলে আমরা কেবলমাত্র এইটুকু বলিতে পারি যে উত্তর-বঙ্গে 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' বলিয়া যে প্রবচন প্রচলিত তাহাতে শিবের যে গীতের কথা উল্লিখিত সেই লুপ্ত গীতগুলিই রামেশ্বরের

আদর্শ ছিল বলিয়া বোধ হয়। গীতগুলি সম্ভবতঃ ছড়া-জাতীয়; তাহাদের ব্যালাড-পর্যায়ে ফেলা যায়।

চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কে ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, বৃহদ্ধর্ম পুরাণের 'ত্বং কালকেতু ছলগোধিকাসি' প্রভৃতি হইতে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল শাখার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে বৃহদ্ধর্ম পুরাণকার এই কাহিনীর কথা উল্লেখ করিলেন কোথা হইতে? এখানে অনুমান করা যাইতে পারে যে কালকেতু ও ধনপতির চণ্ডীদেবীর কৃপালাভের কাহিনী বৃহদ্ধর্ম পুরাণ রচনার পূর্বেই এদেশে প্রচলিত ছিল। বাঙালী কবি সম্ভবত এই কাহিনী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙলা ভাষায় রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে দ্বিজ জনার্দনের কাব্যই প্রাচীনতম। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই কাব্যের একটি ২৫০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছেন; ইহার ভাষা যথেষ্ট মার্জিত।

এইরূপ, কাণা হরিদত্ত মনসা-মঙ্গলের প্রধান কবি। বিজয়গুপ্ত তাঁহার মনসামঙ্গলে হরিদত্তের কাব্যের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, উহাতে অক্ষরের মিল অথবা কথার সঙ্গতি ছিল না এবং রচনার কোনও নির্দিষ্ট রূপ ছিল না। কাজেই, উহাকেও আমরা ব্যালাড জাতীয় কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

এইরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বাঙলা সাহিত্যের ছোট বড় সকল শাখারই আরম্ভ এইরূপ কোন না কোন অজ্ঞাত এবং ক্ষুদ্র কাব্য হইতে যাহাদের আমরা গীতিকা অথবা ব্যালাড বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই সকল প্রাচীন কাব্যগুলি প্রামাণিক গীতিকা; ইহাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক গীতিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশই অজ্ঞাত থাকিয়া চিরদিন আমাদের কৌতূহল বৃদ্ধি করিবে।

এইরূপ সামান্য মূল হইতে বাহির হইয়া বাঙলা কাব্য আপনার প্রসার লাভ করিয়াছে; এই সামান্য উৎস হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। এই সমৃদ্ধ এবং পরিণত রূপ আমরা পাই বাঙলা মঙ্গল কাব্যে অর্থাৎ পাঁচালী গানের মধ্যে। এই মঙ্গল কাব্যের যুগ হইতেই সাহিত্যের ধারাবাহিক ও সুসম্বদ্ধ ইতিহাস রচিত হইতে পারে। কেবলমাত্র ইহাতেই কবির পরিচয়, গ্রন্থের রচনাকাল প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপাদান পাওয়া যায়। এইগুলি বিশদভাবে প্রচারিত এবং রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের একাধিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

পুরাণ জাতীয় গ্রন্থের ন্যায় মঙ্গল-কাব্য বাঙলা দেশে আর্য সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। এই মঙ্গল কাব্য বাঙলা সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইহাদের প্রকৃত রূপ লইয়া এখনও সবিশেষ আলোচনা হয় নাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থকে কেন পাঁচালী বলা হয়, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে।

মঙ্গল শব্দের অর্থ আমরা পাই যে কোনও শুভজনক ক্রিয়া দ্বারা কার্য আরম্ভ; অথবা দূরতম অর্থে স্তুতিগান। কিন্তু পাঁচালীর এরূপ কোনও অর্থ নির্ধারিত হয় নাই। অনেকে বলেন যে ইহা পাঞ্চাল দেশ হইতে আসিয়াছে বলিয়া ইহার নাম পাঁচালী; আবার অনেকে বলেন যে পদ-চালনা করিয়া গাওয়া হইত বলিয়া ইহাকে পাঁচালী বলা হয়। এগুলি নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা বলিয়া মনে হয়। অনেকে মনে করেন যে অতি পূর্বকালে বোধ হয় পঞ্চালিকা বা পুতুল-নাচের সঙ্গে এই ধরণের কাব্য গীত হইত বলিয়া পরে বাঙলা কাব্যের সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছিল—পাঁচালী।

প্রাচীন সাহিত্য হইতে এ বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। একমাত্র বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্তী কর্তৃক প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে রচিত গীতচন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থের খণ্ডিত পুঁথি হইতে পাঁচালীর লক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত আমরা যাহা পাই তাহা এই যে ইহাতে দেবতা, মানুষ বা মনুষ্যরূপী দেবতা, নায়ক হইবেন এবং বহু পদে আখ্যানবস্তু বর্ণিত হইবে। জয়দেব তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দম্‌-কে মঙ্গল-কাব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাজেই আমরা আপাততঃ এইমাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে 'দেব-চরিত্র বর্ণনা' অথবা 'আদর্শ মানব-চরিত্র অঙ্কন' করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পুরাণের সহিত মঙ্গল-কাব্যের একটা চরিত্র এবং ধর্ম্ম-গত সাদৃশ্য আছে; কাজেই, ইহাকে বুঝিতে হইলে আমাদের পুরাণের স্বরূপটিও বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রকার পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,—সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবরণ, মন্বন্তরের বিবরণ, বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণও সেই সকল বংশজাত ব্যক্তিগণের বিবরণ। কিন্তু শাস্ত্রকার এইরূপ বিধান দিলেও এমন কতকগুলি পুরাণ আছে যাহাতে এই পঞ্চ লক্ষণের একটিও নাই। ইহাদের সূচীপত্র প্রস্তুত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেগুলিতে মঙ্গল কাব্যের অনুরূপ বিষয়-বস্তুই আলোচিত হইয়াছে। কাজেই, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে পুরাণ এবং মঙ্গল-কাব্য এক জাতীয় রূপ হইতে একইভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। এই কথা মনে রাখিয়া বিভিন্ন পুরাণের সহিত তুলনা করিয়া মঙ্গল-

কাব্যের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে এখানেও পুরাণের ন্যায় পাঁচটি লক্ষণ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।—

১। সকল জনপ্রিয় দেবতাদের স্তুতিরূপ মঙ্গলাচরণের দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ।

২। দেবতা বিশেষের মাহাত্ম্য বর্ণন ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থের উৎপত্তি।

৩। দৈব লীলায় ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্য-বিপর্যয়।

৪। সুখ-দুঃখের বিশদ বর্ণনা (বার মাস্যা প্রভৃতি)।

৫। কলহাদি হাস্যরসাত্মক ঘটনার সমাবেশ (সম্ভবতঃ পালা গানকে জনপ্রিয় করিবার জন্য)।

এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া যদি আমরা এরূপ অনুমান করি যে মূলে এই জাতীয় পাঁচটি লক্ষণ ছিল বলিয়া হয়তো মঙ্গল-কাব্যকে পাঁচালী বলা হয়, তাহা হইলে বিশেষ অসঙ্গত হইবে না।

'মঙ্গল' শব্দটি এক বিশেষ প্রকারের শ্রব্য-কাব্য সম্বন্ধে, তুর্কী বিজয়ের পূর্বেই বাঙলা ভাষায় রূঢ়ী হইয়া গেলেও প্রকৃত পক্ষে ইহার পর হইতেই ধারাবাহিক সাহিত্য প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই ইহাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রভাব পড়িয়া ইহাকে একটি অন্যপ্রকার রূপ দিয়াছে বলিয়া গীতগোবিন্দের অনুরূপ মঙ্গল কাব্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সহিত পরবর্তীকালের মঙ্গল কাব্যের কোনই মিল নাই। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল তাহাই এখন আলোচিত হইবে।

কালানুযায়ী জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পুরাণকার পুরাণের পুরাতন বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন সাধন এবং নূতন সম্পাদন সংযোজন দ্বারা উহাকে সর্বজনপ্রিয় করিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। সেইজন্য অতি প্রাচীন পুরাণের সহিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণের যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গল কাব্যের প্রাচীন নিদর্শন বেশি নাই। কিন্তু সেখানেও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

কোনও প্রতিষ্ঠান বেশিদিন একভাবে চলিলে তাহার মধ্যে শিথিলতা এবং ত্রুটি প্রবেশ করে; তখন ইহার সংশোধন দ্বারা নবজীবন দান না করিলে ইহা ধ্বংস হইয়া যায়। হিন্দুধর্মকেও বহুবার এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বৈদিক ধর্মে যে ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছিল বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে তাহার সংশোধনে ব্রাহ্মণগণ বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার ফলে শাস্ত্রগ্রন্থের সূত্রগুলি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করা হইলে তাহাতে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। তারপর হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম অবনতির পথে ধাবিত হইবার পর ইসলামধর্মের আবির্ভাব হয়। হিন্দুসমাজের শ্রেণীবিভাগের নির্মম অত্যাচার এবং বৌদ্ধ-বিদ্বেষের সম্মুখে ইসলামধর্ম তাহার সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব যে সাম্যের চিত্র প্রদর্শিত করে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া

অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ এই নবাগত ধর্মকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়াছিল। এই বিপদের হাত হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার যে আভ্যন্তরিক সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। সকল শ্রেণীর হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করিয়া স্বধর্মে তাহাদের আস্থা-স্থাপনের জন্য যে প্রচারকার্যের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা সাধিত হইয়াছিল এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে। সাম্যবাদী ইসলামের প্রভাব প্রতিরোধ করিবার জন্য সমাজের নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্যদিগকে কাব্যের নায়ক করা হইল; তাহাদের মধ্য দেবদুর্লভ গুণের সমাবেশ করা হইল এবং দেখান হইল যে হিন্দু দেব-দেবী তাহাদের অবহেলা করে না। তাই ব্রাহ্মণ-কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক কালকেতু জাতিতে ব্যাধ এবং ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলের কালুডোম সত্যনিষ্ঠায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ধর্মকলহে যদি বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা এইভাবেই হইয়াছিল।

মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। দ্বাদশ অশ্বারোহীর ভয়ে, লক্ষ্মণসেনের পলায়নের কাহিনীর কোনও ঐতিহাসিক মূল্য না থাকিলেও ইহার মধ্যে বাঙালী জাতির একটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক তো আর বৃদ্ধ হয় নাই; তাহারাই বা ইহার প্রতিরোধ করিল না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে গীতগোবিন্দ গীতমুগ্ধ বাঙলাদেশ হইতে পৌরুষ বিদায় লইয়া ভীরুতা এবং কাপুরুষতাকে একাধিপত্য স্থাপন করিতে স্থান দিয়াছিল। জাতির এই দুর্বলতা দূর করিতে হইলে শক্তির সাধনা প্রয়োজন; তাই মঙ্গল-কাব্যে এরূপ দেবদেবীর আবির্ভাব করিতে হইল, যাঁহাদের ক্ষমতা আমাদের চক্ষু ধাঁধাইয়া দিতে পারে, যাঁহাদের অঘটন-ঘটন-সক্ষম শক্তি দেখিয়া আমাদের সন্দেহের অবকাশ থাকে না, আমরা সহজেই ভক্তিতে অবনতচিত্ত হইয়া যাই।

কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে—বাঙলা দেশ এক সময়ে বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল; এখানে বহু মঠে বহু সংখ্যক ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী বাস করিত। হিন্দু-ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পর ইহাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটা চাপা হিন্দু-বিদ্বেষ জন্মায়। তাই ইহারা নবাগত ইসলাম-ধর্মকে একটা দেবানুগ্রহরূপে গ্রহণ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। হিন্দুগণই বা ইহাদের ছাড়িবে কেন? তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া ইহাদের উপর যে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, তাহা এত সহজে লুপ্ত হইতে তাহারা দিতে চায় নাই। হীনযানী বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে সকল দেবদেবী দেখা দেয়

তাহাদের সহিত মিশাইয়া নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি করা হয়। আমরা ইহাদের লৌকিক দেবদেবী নামে অভিহিত করিয়াছি এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিকে লৌকিক ধর্ম নামে পরিচিত করিতেছি। এই সকল দেবদেবীগণের মধ্যে ধর্মঠাকুর এবং চণ্ডীদেবীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায়। বলা বাহুল্য, এই মঙ্গল দেবদেবী আর্যপ্রভাব পূর্ববর্তী বাঙলার দেবদেবী।

মঙ্গল-কাব্যের এইরূপ ইতিহাস সম্ভবপর হইলেও ইহা আপনার পথে আপনি চলিয়াছে। প্রায় সকল দেবদেবীর কোন না কোন ভক্ত আছেন, যিনি এই শ্রেণীর কাব্য রচনা করিয়া নিজ দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। তাই মঙ্গল কাব্যই বাঙলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং বৃহত্তম কাব্য-শাখা।

মঙ্গল-কাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, মঙ্গল-কাব্য বলিতে কাব্য রচনার একটি রীতিবিশেষকে বুঝায়। পুরাণের ন্যায় ইহারও সম্ভবতঃ পাঁচটি লক্ষণ ছিল বলিয়াই ইহাকে পাঁচালিও বলা হয়। এই লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে যাহা অনুমান করিতেছি, সেগুলি পর্যালোচনা করিলে সহজেই মনে হয় যে মধ্যযুগে বাঙলা ভাষায় যে-কোনও কাব্য রচিত হইয়াছে তাহাকেই আমরা এই মঙ্গল-কাব্যের পর্যায়ে ফেলিতে পারি। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে; রাবণের ভাগ্য বিপর্যয়ে ভগবানের শক্তি প্রকট হইয়াছে; তাই মনে হয় যে রামায়ণকে আমরা অবাধে শ্রীরামমঙ্গল বলিতে পারি। এই হিসাবে ধরিলে বৈষ্ণব-পদাবলীকেও বাদ দেওয়া শক্ত হইয়া পড়ে। পদাবলীর এক একটি পদ একটি কাহিনীরই অংশ বিশেষ; পৃথক অপেক্ষা ইহাদের সমগ্রভাবে ধরিতে হইবে। কাজেই, পদাবলীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং রাধার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনীই সেখানে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ইহার মধ্যেও মঙ্গল-কাব্যের মূল সূত্র বর্তমান থাকার কোনই বাধা দেখি না। বস্তুতঃ জয়দেব তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দম্-কে স্বয়ং "মঙ্গলম্-উজ্জ্বল-গীতি" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাই আমরা ইহার মধ্যে মঙ্গল এবং গীতি কাব্যের প্রথম অঙ্কুর পাইতেছি।

মঙ্গল-কাব্য যে কাব্য-রচনার একটি বিশেষ রীতি বা ঢঙরূপেই বিবেচিত হইত তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই নিজ নিজ দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য মঙ্গল-কাব্য রচনা করিত। বৈষ্ণব দিগের কথা ধরা যাক। পদাবলীতে যেমন মঙ্গল-কাব্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে, তেমনি কিন্তু সম্পূর্ণাঙ্গ

মঙ্গল-কাব্যও ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদেরও সংখ্যা কিছু কম নহে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোবিন্দমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে পারি। এই রূপ চৈতন্য-কাব্য সম্বন্ধেও বলা যায় যে, চৈতন্য বিষয়ক পদাবলীর সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। এই রূপে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ দেবতার মঙ্গল-কাব্য আছে। কাজে কাজেই, একথা আমরা বলিতে পারি যে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস মঙ্গলকাব্য লইয়া আরম্ভ হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের রচনাকাল অধিক ক্ষেত্রেই অস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে আবার কোনও তারিখ দেওয়া হয় নাই। কাজেই কোনও কবিকে অবিসংবাদিতরূপে বাঙলার আদি কবি বলিয়া স্বীকার করায় নানারূপ গোলযোগের আশঙ্কা আছে। সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং যুক্তিসঙ্গত উপায় হইতেছে এই যে, যে-সকল কবি এক একটি ধারা বা কাব্য-শাখা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা আদি কবির সম্মান দিতে পারি। এই হিসাবে চার-পাঁচজন কবির এই সম্মান লাভ করিবার অধিকার আছে। আমরা একে একে তাঁহাদের বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃত্তিবাস ও রামায়ণ

প্রাচীন বাঙালী কবিগণের মধ্যে কৃত্তিবাসই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয় কবি ছিলেন। ইঁহার রামায়ণ এখনও বাঙলা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমান আদর ও সম্মান লাভ করিতেছে। কিন্তু বাঙলা দেশের এই আদি কবির জন্মের তারিখ লইয়া নানা প্রকার মতভেদ রহিয়াছে। কৃত্তিবাস তাঁহার বিরাট রামায়ণ গ্রন্থের মধ্যে কোথাও তাঁহার সময় নির্ধারণের উপযুক্ত কোনও প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বলিয়া বর্ণিত এক পুঁথি হইতে কৃত্তিবাসের একটি আত্মবিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহার পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগৃহীত গ্রন্থের মধ্য হইতেও অনুরূপ একটি বিবরণ উদ্ধার করা হইয়াছে। কৃত্তিবাসের সময় নির্ণয়ে ইহাই আমাদের একমাত্র উপাদান। কিন্তু এই বিবরণে সুস্পষ্টভাবে কিছুই লিখিত হয় নাই বলিয়া একাধিক তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে।

এই আত্ম-বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কৃত্তিবাসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারসিংহ (নরসিংহ) ওঝা বেদানুজ মহারাজের পাত্র ছিলেন। কিন্তু বেদানুজ নামে কোনও রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ লিপিকারের অজ্ঞতার জন্য 'যে দনুজ' কথাটি বেদানুজ-রূপে লিখিত হইয়াছে। এই দনুজ মহারাজ বোধ হয় পূর্ববঙ্গের সেন রাজবংশের দনুজ মাধব বা দনৌজামাধব। ইনি আনুমানিক ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দিল্লীর সুলতান বলবন যখন বঙ্গের মঘিসুদ্দিন তুঘরল খাঁর বিদ্রোহ দমন করিতে আসেন, তখন এই দনুজ মাধব তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খালজি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর (১১৯৯ খ্রীঃ) পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের বংশ প্রায় ১০০ বৎসর রাজত্ব করে। সোনার গাঁ'র এই সেন বংশের রাজত্বের অবসান হয় ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ে মুসলমান বিজেতা সামসু-দ্-দীন ফিরোজ শাহ কর্তৃক যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তাহারই ফলে নরসিংহ ওঝা পশ্চিম বঙ্গের ফুলিয়া নামক স্থানে বাস স্থাপন করেন। এই ফুলিয়া নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকট এবং রাণাঘাট হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। এই সময়ে তুর্কী গাজি জাফর খাঁ এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি পূর্বে হিন্দু-ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন; পরে এই ধর্মের প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। এজন্য নরসিংহ এই স্থানকেই পরম নিরাপদ মনে করিয়া এখানেই বসবাস স্থাপন করেন। নরসিংহের পৌত্র মুরারি, মুরারির পুত্র বনমালী এবং বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস। এই কয় পুরুষের সময় শতাধিক বৎসর ধরিলে কৃত্তিবাস ১৪শ শতাব্দীর শেষপাদে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে জন্মগ্রহণ করেন।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে আছে—

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥"

এই পাঠ ধরিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় গণনা করিয়া ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাস যে রাজসভার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হিন্দু রাজার। রাজার সমস্ত কর্মচারী হিন্দু. তিনি স্বয়ং সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারেন, এবং কবিকে "চন্দনের ছড়া" দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। কবির ভাষায়—

"দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।" ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোনও হিন্দু রাজা গৌড়ে

অর্থাৎ বাঙালায় ছিলেন না বলিয়া যোগেশ বাবু ঐ তারিখ বাতিল করিয়া আর একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

দিনাজপুরের জমিদার গণেশ এই সময়ে রাজা হ'ন সমস্ত বাঙলা দেশ জয় করে। রাজা গণেশের কোনও মুদ্রা পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু ঐ সময়ে (১৪১৮ খ্রীঃ) জলালু-দ্-দীন ও দনুজমর্দনের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। আমরা জানি যে রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া জলালু-দ্-দীন মুহম্মদশাহ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে দনুজমর্দনদেব ও রাজা গণেশ একই ব্যক্তি।

বিদ্যানিধি মহাশয় দনুজমর্দন—রাজা গণেশের ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকে মুদ্রা প্রচার ধরিয়া ১৩২০ শকে আদিত্যবার ও শ্রীপঞ্চমী পাইয়াছেন; তারিখ ১৬।১৭। তিনি লিখিয়াছেন—"১৩২০ শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী ও হিন্দু গৌড়েশ্বর দুই-ই পাইতেছি। কৃত্তিবাস এগার বৎসর বয়সে পাঠার্থে উত্তর দেশে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে রাজভেটে গিয়াছিলেন। নয় দশ বৎসর পাঠ করিয়া থাকিবেন। রাজভেটের সময় তাঁহার বয়স ২০।২১ বৎসর হওয়া সম্ভবপর। ইহাও মিলিয়া যাইতেছে।"

অনেকে মনে করেন যে এই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ নহেন, রাজশাহী তাহিরপুরের কংসনারায়ণ। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে রিয়াজ্ উস্ সালাতিন্ নামক গ্রন্থে এই রাজাকে 'কান্স্' বলা হইয়াছে; কান্স্ কংসের অপভ্রংশ, গণেশের নহে। কংসনারায়ণের সভাসদ ছিলেন কেশব খাঁ এবং শ্রীকৃষ্ণ; ইঁহারাই লিপিকার প্রমাদে কেদার খাঁ এবং শ্রীবৎসরূপে লিখিত হইয়াছে। গণেশের সময়োচিত রাজসভায় কোনও রূপ মুসলমানী হাব-ভাব বা আদব-কায়দার আভাসও আত্ম-বিবরণে নাই। অধিকন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে ভাষাগত সাম্যও যথেষ্ট আছে! এইজন্য কেহ কেহ ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দকেই কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে কংসনারায়ণের অভ্যুদয়কাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ = ১৪৭২ শকাব্দ। যে পুথি হইতে কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণটি উদ্ধার করা হইয়াছিল, তাহারই তারিখ ছিল ১৪২৩ শকাব্দ। কাজেই, কৃত্তিবাস যে কংসনারায়ণের পূর্ববর্তী, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের কারণ নাই।

কাজেই, পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই কংস বা গণেশ ছাড়া অন্য কোনও হিন্দু এবং আত্মবিবরণের বর্ণনায় ব্রাহ্মণ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন নাই। কৃত্তিবাস

তাঁহারই সময়ে বর্তমান ছিলেন ; তাঁহার জন্মশক ১৩২০। ইংরাজী ১৩৯৯ সালের পুরাতন পাঁজির ১২ই জানুয়ারি।

কৃত্তিবাসের কবিতা শুনিয়া—

"সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥"

এইরূপে গৌড়েশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বদা মূলের অনুসরণ করেন নাই ; তাঁহার গ্রন্থে এমন ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে যাহা মূলে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন যে রাম-জন্মের "ষাটি হাজার বৎসর" পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণ লিখিয়াছেন। রাবণবধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মা রাবণের মৃত্যুবাণ তাহারই হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, একথা বাল্মীকি উল্লেখ করিয়াছেন। হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বত ও বিশল্যকরণী ঔষধ আনয়ন কোনও রামায়ণেই নাই, কিন্তু কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন যে তিনি প্রাচীন রামায়ণ হইতেই ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও মহীরাবণ, অহীরাবণ, হনুমানের সূর্যকে বন্দী করা প্রভৃতি আরও ছোট খাট অনেক বিষয় কৃত্তিবাসের গ্রন্থে নূতন দেখা যায়।

কিন্তু এই সকল বিষয় যে কৃত্তিবাসেরই রচনা, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত রূপ পাইতেছি। ইহাতে অন্য কবির রচনাও নির্বিবাদে কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা 'অঙ্গদ রায়বার'এর উল্লেখ করিতে পারি। কৃত্তিবাসের গ্রন্থে এই পালাটি যে আকারে আছে তাহা কবিচন্দ্র নামক এক পরবর্তী কবির লিখিত। কৃত্তিবাসের কাব্য সর্ববাদীসম্মতভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়াও পরবর্তী লেখকদের রামায়ণ হইতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠাংশগুলিও কৃত্তিবাস রচিত মনে করিয়া তাঁহারই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

কিন্তু ইহা দ্বারা কৃত্তিবাসের গৌরবের কোনও হ্রাস হয় নাই। সকল দিক হইতেই তাঁহার রচনা সার্থক হইয়াছে। তিনি রামায়ণকে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর নিজস্ব করিয়া সৃষ্টি করিয়া ইহাকে জাতীয় মহাকাব্যের স্থানে উন্নীত করিয়াছেন। তাঁহার সফলতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বহু কবি পরবর্তীকালে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই এই আদি কবির যশ ও গৌরব নষ্ট করিতে পারেন নাই।

রামায়ণ-রচনার ফলে কৃত্তিবাসের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় অনেক যশঃপ্রার্থী কবি রামায়ণ রচনায় মন দিয়াছিলেন। এই সকল রামায়ণকারদের

মধ্যে সকলেই প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। হয়তো এমন অনেক কবি ছিলেন যাঁহাদের নাম আমরা শুনি নাই ; তাঁহাদের গ্রন্থও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যতগুলি আমরা পাইয়াছি, তাহাদের সংখ্যাও কিছু কম নহে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার পর অন্য কাহারও রামায়ণ-রচনার সার্থকতা নাই এরূপ অনুমান যাহাতে কেহ করিতে না পারেন এই জন্য সকল কবিই গ্রন্থারম্ভের পূর্বে একটু ভণিতার সংযোগ করিয়াছেন। এখানে বলা হইয়াছে যে কোনও দেবতা অথবা ব্যক্তি-বিশেষের আদেশে কবি উপায়ান্তর না দেখিয়া রামায়ণ-রচনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

এরূপ রামায়ণ-রচয়িতার সংখ্যা কিছু কম নহে। তবে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবির রচনা-কাল পাওয়া যায় না। এইজন্য নানারূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনা করিয়া একটা আনুমানিক সময় নির্ধারণ করা হইয়া থাকে।

পুঁথির প্রাচীনতা এবং গ্রন্থের ভাষার সাহায্যেই অনেক সময়ে কবির রচনাকাল নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কবির আত্মবিবরণীতে যে সকল ব্যক্তি এবং ঘটনার উল্লেখ থাকে, তাহাদের সাহায্যেও অনেক সময়ে অনেক কবির আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা হয়। কিন্তু ইহাতে যে নানাবিধ গোলযোগের সম্ভাবনা আছে, তাহা আমরা কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল আলোচনার সময়ে দেখিয়াছি। যেখানে বাঙলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবির সময় লইয়া এত মতভেদ ঘটিতে পারে, সেখানে অল্প-পরিচিত কবির রচনাকাল নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। যৎসামান্য উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া এই গুরুতর কার্য সম্পাদনের চেষ্টা দুঃসাহসের কাজ। এইজন্য অপরাপর রামায়ণকারদিগের রচনাকাল অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ না করিয়া মোটা-মুটিভাবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

এখন আমরা ছোটখাট সকল রামায়ণকারদের নাম দিয়া দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত না করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ এবং শক্তিশালী কবিদিগের পরিচয় দিব।

কৃত্তিবাস-পরবর্তী রামায়ণকার

কৃত্তিবাস-পরবর্তী রামায়ণকারদের মধ্যে অনন্ত-রামায়ণকেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই কবির পরিচয় অথবা তাঁহার কাব্যরচনাকাল সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় নাই। ইহার যে পুঁথিগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি

দেখিতে অতি পুরাতন এবং ইহার ভাষাও অতিশয় প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই উভয় কারণেই কবিকে প্রাচীন মনে করা হইয়াছে। কারণ দুইটি তুচ্ছ মনে হইলেও এরূপ ক্ষেত্রে ইহাদের সাহায্যেই কাজ চালাইতে হইবে।

অনেকে বলেন যে অনন্তের বাড়ি আসামে ছিল এবং সেখানে তিনি অনন্ত কন্দলী নামে পরিচিত। ইনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ এবং ইঁহার অপর নাম ছিল রামসরস্বতী। তবে এগুলি প্রায়ই জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত, সত্যাসত্য নির্ধারণের কোনও উপায় নাই।

সম্ভবতঃ প্রাচীন বলিয়াই অনন্তের ভাষা অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিল। তবে ইহাতে যে একেবারেই রস নাই একথা বলা যায় না। দীনেশবাবুর গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশ হইতে এই নমুনাটি পাঠ করিলেই গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে একটু ধারণা হইবে :

রাঘবর ভার্য্যাতে তোঁহোর ভৈল মন।
তিথাল খান্তাত জিহ্বা ঘর্ষণ দুর্শন॥
হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক ছাস।
সপুত্র বান্ধবে পাপি হৈবি সর্বনাষ॥

অদ্ভুতাচার্য্য নামধারী একজন একখানি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ; শ্রীখণ্ডের এক ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যের মধ্যে ইনি যে আত্মবিবরণী দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে কবি নিরক্ষর ছিলেন; সাত বৎসর বয়সে যখন তাঁহার উপনয়ন হয় নাই তখন একদিন—

মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি॥
প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত হইল নাম সেই সে কারণ॥

কবি সম্ভবতঃ কালীর উপাসক ছিলেন; তাই সীতাদেবীকে কালীর অবতার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্ভুত রামায়ণের পুঁথিতে অস্পষ্টভাবে যে তারিখ দেওয়া আছে তাহা গ্রন্থরচনার কি পুঁথি নকলের বুঝা যায় না। তথাপি কবিকে আন্দাজ ২০০ বৎসর পূর্বের বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অন্যান্য উপাদানের সহিত বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র দীপিকার তুলনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে "অদ্ভুতাচার্য্যকে মোটামুটি আকবরের সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কাজেই তিনি কৃত্তিবাস অপেক্ষা দেড়শত বৎসর পরবর্তী।"

অদ্ভুত-রামায়ণ এক সময়ে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কৃত্তিবাসের

নামে প্রচলিত রামায়ণে তাঁহার রচনা বহুল পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে কবিত্বশক্তিতে ইনি কৃত্তিবাস অপেক্ষা বেশী নিকৃষ্ট নন।

মৈমনসিংহ জেলার মহিলা কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণ-রচনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতী মনসা-মঙ্গলের বিখ্যাত কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। চন্দ্রাবতী পিতাকে এক সময় মনসা-মঙ্গল রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর জীবনী ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনীতে করুণ; এই উপাখ্যান লইয়া মৈমনসিংহ জেলায় গীতিকাও রচিত হইয়াছে।

কথিত হয় যে প্রণয়ী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে রামায়ণ-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সীতার বনবাস পর্য্যন্ত রচনার পর পরলোক গমন করিয়াছিলেন। বংশীদাসের মনসা-মঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ হইবার তারিখ ঐ গ্রন্থে ১৪৯৭ অর্থাৎ ১৫৭৫—৭৬ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে। ইহা হইতে আন্দাজ করিয়া চন্দ্রাবতীর ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ করুণরসে মধুর। সম্ভবতঃ নিজের করুণ জীবনের ছায়া তাঁর সীতা চরিত্রকে করুণ করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজও মৈমনসিংহ জেলার স্ত্রীলোকেরা সকল প্রকার ধর্মানুষ্ঠানেই এই রামায়ণ গান করিয়া থাকেন। শুধু রামায়ণই নয়, এই প্রাচীন মহিলা-কবি রচিত মনসাদেবীর গান, মলুয়া, কেনারাম দস্যুর কাহিনী প্রভৃতি গীতিকা তাহাদের কবিত্বগুণ এবং প্রাঞ্জল ভাষার জন্য কবিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

চন্দ্রাবতীর পর যাঁহাদের রামায়ণ-রচনা উল্লেখযোগ্য তাঁহাদের মধ্যে কবিচন্দ্র প্রধান। অনেকে অনুমান করেন যে ইঁহার নাম ছিল শঙ্কর; রামায়ণ ভিন্ন মহাভারত এবং ভাগবতের অনেকখানি ইনি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ভাগবতের অনুবাদে ইঁহার পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্ত্তী বলিয়া লিখিত আছে। ইনি গোপাল সিংহ রাজার আদেশে এই অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করেন। রামগতি ন্যায়রত্ন এই গোপালকে মল্লবংশীয় বনবিষ্ণুপুরের অধিপতি বলিয়া মনে করিয়াছেন; কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন ইঁহাকে বর্দ্ধমানরাজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তবে বাঙলা-সাহিত্যে এতগুলি কবিচন্দ্র উপাধিধারী লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, যে কোন্‌টি কাহার রচনা তাহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব।

যে কবিচন্দ্র রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভাই তাঁহার প্রতি অবিচারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনায় সফলতা লাভ করিয়া

প্রসিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার পর যে কেহ রামায়ণের কোনও অংশ সুললিত, সরসভাবে রচনা করিলে তাহা কৃত্তিবাসের কীর্তি বলিয়া বিবেচনা করা হইত। এইভাবে কবিচন্দ্রের কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশগুলিও কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত! দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা 'অঙ্গদ রায়বারের' কথা উল্লেখ করিতে পারি। বটতলার পুস্তকালয় হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের দেশে প্রচলিত। কিন্তু এই বটতলা-সম্পাদক যাহার রচনায় যেটুকু ভাল পাইয়াছিলেন, তাহাই কৃত্তিবাসের বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতে যে রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাতে এই 'অঙ্গদ রায়বার' অতি সংক্ষেপে বর্ণিত। কিন্তু বটতলার কৃপায় কবিচন্দ্র রচিত অঙ্গদ রায়বারটি আমরা কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়াই জানিয়াছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে এই অংশটুকু পড়িলেই কবিচন্দ্রের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমরা সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

কোন বাপ তোর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে।
কোন বাপ তোর বাঁধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে॥
কোন বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গতে গেছিল মিথিলা।
কোন বাপ তোর কৈলাস পর্ব্বত তুলিতে গিছিলা॥
কোন বাপ তোর জব্দ হল জামদগ্ন্যের তেজে।
মোর বাপ তোর কোন বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
ইহা সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা॥

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের 'দীনার দ্বীপ' (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ঢাকা জেলার মহেশর্দি পরগণার অন্তর্গত ঝিনারর্দি) নিবাসী পিতা ও পুত্র ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করেন। ষষ্ঠীবর গুণরাজ উপাধিযুক্ত ভণিতাও ব্যবহার করিয়াছেন।

ষষ্ঠীবর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং সুলেখক বলিয়া আদৃত হইতেন; সরল, সংক্ষিপ্ত এবং পরিপক্ক রচনার জন্য ইঁহার গ্রন্থগুলি চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছিল।

বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রাম নিবাসী জগৎরাম রায় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে এই গ্রন্থের শেষ অংশটি কবির পুত্র রামপ্রসাদের রচনা। পুরাণ, রামায়ণ এবং রামচন্দ্র সম্বন্ধে যত কাহিনী প্রচলিত ছিল, জগৎরাম তাঁহার গ্রন্থে সে সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার

গ্রন্থটি অভিনব সন্দেহ নাই। কবির রচনায় পরিপক্ক ও উপাদেয় বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

নদীয়া জেলার মেটেরী গ্রামবাসী রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার আদেশে স্বগৃহে রাম-সীতার বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ রচনা করেন। কবি প্রতিভাবান ছিলেন সন্দেহ নাই; তাঁহার কাব্যের অনেক অংশই সরস ও চিত্তাকর্ষক। ব্যঙ্গে কবির বিশেষ হাত ছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার কাব্যের অনেক অংশ গ্রাম্য বলিয়া বাতিল হইয়া যাইতে পারে কিন্তু প্রাচীনকালে এই সকল অংশই আসর জমাইতে পারিত। এই গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে হনুমান কবির অত্যন্ত প্রিয় ছিল। লঙ্কায় বন্দী অবস্থায় হনুমানের উক্তিটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম:

হনুমান কন মোর বিবাহ না হয়।
কন্যাদান করিবে রাবণ মহাশয়॥
রাবণের কন্যা মোর গলে দিবে মালা।
রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিত শালা॥
চারিদিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর।
কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর॥
হনুমান কন মোর বিবাহের কাজ নাই।
এমন মারণ খায় কাহার জামাই॥

একশত বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার মাড়-গ্রামনিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী 'রাম-রসায়ন' নামে রামায়ণের এক অনুবাদ রচনা করেন। এই গ্রন্থে কবি বাল্মীকি এবং তুলসীদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন এবং করুণ রসাত্মক সকল অংশগুলিই বাদ দিয়াছেন। কাব্যে সংস্কৃত ও হিন্দী ছন্দের নানারূপ ব্যবহার আছে। কবি সংস্কৃত শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও হিন্দী শব্দও বহু প্রয়োগ করিয়াছেন।

রঘুনন্দনের রচনার নমুনা স্বরূপ নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি উদ্ধৃত করা হইল:

এথা রঘুবর করিতে সমর
সুখেতে মগন হইয়া।
অতি সুকোমল তরুণ বাকল
পরিলা কটিতে আঁটিয়া॥
শিরে অবিকল জটার পটল
বাঁধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া।
পরিলা বিকচ কঠিন কবচ
শরীরে সুদৃঢ় করিয়া॥

বুদ্ধদেব নামে এক ব্যক্তি 'রামলীলা' নামে এক রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইনি বৌদ্ধধর্মপ্রচারক জগৎবিখ্যাত বুদ্ধদেব নন; ইঁহার প্রকৃত নাম রামানন্দ ঘোষ। গ্রন্থ হইতে কবির পরিচয় বিশেষ জানা যায় না। তবে মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়া মনে হয় যে সম্ভবতঃ ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ইঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া প্রচার করেন এবং বৈষ্ণব ও মুসলমানদিগকে দমন করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

এই সকল ছাড়াও বহু ছোট-বড় রামায়ণ-রচয়িতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহাদের রচনায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই এবং সকলের আলোচনাও সম্ভব নয়।

আদি কবি (২) মালাধর বসু

যাঁহার সরস কবিতার পদ লালিত্যে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান গৌড়েশ্বর রুকনু-দ্-দীন কবিকে গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, যাঁহার কাব্যের হৃদয়গ্রাহী ভাবে অভিভূত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব কবির পুত্র সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ বসুকে সাদর সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং বসু বংশকে বাঙলা দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রযাত্রিগণকে পরিচয় চিহ্ন স্বরূপ 'ডুরি' প্রদানের অধিকার দিয়াছিলেন—তাঁহার নাম মালাধর বসু। কবি আপনার গ্রন্থে রচনার সন-তারিখ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন; তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি ১৩৯৫ শকাব্দে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে রচনা শেষ করেন। খ্রীষ্টাব্দ হিসাবে ইহা ১৪৭৩—১৪৮১ দাঁড়ায়।

গ্রন্থের মধ্যে কবি যে আত্মবিবরণী দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। তাঁহাদের বাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে।

মালাধর যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণ বিজয়; কোন কোন পুঁথিতে ইহা গোবিন্দবিজয় বা গোবিন্দমঙ্গল-রূপে লিখিত হইয়াছে। বিজয় শব্দটি এখানে প্রস্থান, প্রয়াণ বা তিরোধান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে।

মালাধরের গ্রন্থটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ। কিন্তু

সেকালে আক্ষরিক অনুবাদের রীতি ছিল না; মালাধরও তাঁহার অনুবাদকে আক্ষরিক করেন নাই। তিনি গল্পাংশের ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন। তবে এই দুই স্কন্ধে যেখানে কোনও তত্বকথা আছে, কবি তাহারও তাৎপর্য্যগুলি দিয়াছেন। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একাধিক প্রাচীন পুঁথিতে শ্রীরাধাকে লইয়া দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, প্রভৃতি মনোমুগ্ধকর কাহিনী লিপিবদ্ধ দেখা যায়। শ্রীরাধার প্রসঙ্গ দূরে থাক, তাঁহার নাম উল্লেখ পর্য্যন্তও ভাগবতে নাই। এই জন্ত ভাগবতের কোনও অনুবাদে এগুলি থাকিতে পারে না বলিয়া অনেকের মতে এগুলি প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্ত্তী সংযোজনা। কিন্তু এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দম্ এদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বাঙলা দেশে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কাহিনী বিশেষভাবেই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন নামক সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থটিতে আগাগোড়া এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মালাধর বসু যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া দেশে প্রচলিত রাধা-বিষয়ক কাহিনীটুকু বাদ দিবেন, একথা জোর করিয়া বলা যায় না।

আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। মালাধরের যে কথা কয়টি শ্রীচৈতন্যদেবকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহা হইতেছে :—

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

এই বাক্যটিতে যে মনোভাব বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের প্রেমধর্ম্মের পূর্ব্বাভাস। প্রাণনাথ কথাটিতে যে কান্তা-ভাব অর্থাৎ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা স্ত্রী জাতির মধ্যেই সম্ভব। রাধা ভিন্ন অপর কাহারও সহিত শ্রীকৃষ্ণের এরূপ সম্পর্কের কথা ইতিপূর্ব্বে জানা ছিল না বলিয়া মালাধর রাধা প্রসঙ্গের উল্লেখও করিয়া থাকিতে পারেন। কাজেই, ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

মালাধরই সর্ব্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রাচীন পুঁথিগুলি দেখিয়া মনে হয় যে ইহা পাঁচালীরূপেই লিখিত হইয়াছিল এবং ইহাকে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। ইহাতে পরিচ্ছেদ বিভাগ নাই, রাগরাগিনীর বিভাগ আছে। কাজেই মনে হয় যে ইহা শ্রোতাদের সম্মুখে বাদ্যসহযোগে গীত হইত। গ্রন্থটির অধিকাংশ পয়ার ছন্দে লিখিত; তবে মাঝে মাঝে ত্রিপদী ছন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।

মালাধর একাধারে কবি, ভক্ত এবং ভাবুক ছিলেন। তাঁহার মধ্যে এই তিন

গুণের সমাবেশ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার রচনা হইয়া উঠিয়াছিল মর্মস্পর্শী। বৈচিত্র্যহীন একটানা একঘেয়ে পয়ার ছন্দে একটির পর একটি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর কাহিনীর সহজ, সরল ভাষায় বর্ণনা পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত না, গ্রন্থটি কাব্য না হইয়া ঘটনার তালিকায় পরিণত হইত। এইখানেই মালাধরের কৃতিত্ব। তিনি আড়ম্বরহীন ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিরস এবং ভাবুকতায় সিঞ্চিত হইয়া মধুময় হইয়া উঠিয়াছে; দেশের জনসাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বঙ্গেশ্বরকে পর্যন্তও মুগ্ধ করিয়াছে। এইজন্য মালাধর প্রাচীন বাঙলার আদিকবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছেন।

তাঁহার রচনার দৃষ্টান্তরূপে আমরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নুপুর দিমু বলে কোন্থজন॥
কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে।
মণিময় হার দিমু কোহ্ন সখি বলে॥
কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোন্থজন।
কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন॥
শীতল বাতাসে দিমু অঙ্গ জুড়ায়।
কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গায়॥
কেহ বলে চূড়া বানাইমু নানা ফুলে।
মকর কুণ্ডল পরাইমু শ্রুতিমূলে॥
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কান।
কর্পূর তাম্বুল সনে জোগাইব পান॥

শিবায়ন

মোহেঞ্জোদড়োতে ভূগর্ভ খননের ফলে যে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমানিত হইয়াছে যে সেখানে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০-৩০০০ অব্দে এক উন্নত, সুসভ্য জাতি বাস করিত। বস্তু-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন যে ভারতবর্ষের এই আর্য-পূর্ববর্তী জাতির সহিত ঋগ্বেদের আর্যগণ পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা যাহাদিগকে কৃষ্ণগর্ভ, অনাস, দাস এবং দস্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহারাই সে-সময়ে মোহেঞ্জোদড়োতে বাস করিত। ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত। ইহাদের ধর্ম আর্যধর্ম হইতে বিভিন্ন, কারণ ইহাদিগকে অন্যব্রত বলা হইয়াছে।

মোহেঞ্জোদড়োতে যে-সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে একটি ত্রি-মুখ, ত্রি-নেত্র মূর্তি এক বৃক্ষতলে

উপবিষ্ট, তাহার মস্তকে তিনটী শৃঙ্গের মুকুট এবং চারিপাশে বিবিধ প্রকারের পশু বিরাজ করিতেছে। এই মুদ্রা হইতে সকলে অনুমান করিয়াছেন যে সেখানে এমন একটি দেবতার পূজা হইত যাহাকে পরবর্তী শিবের বা পশুপতির পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে। কাজেই, শৈব-ধর্মের মূল আমাদিগকে মোহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপে লইয়া যাইতেছে!

প্রকৃতির মধ্যে যে ধ্বংসের লীলা, ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রবল প্রকোপ, তাহা কোনও দেবতার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান করিয়া ঋগ্বেদে তাঁহাকে রুদ্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইনি শান্ত থাকিলে প্রকৃতিও শান্ত থাকিয়া আমাদের মঙ্গল করেন বলিয়া ইনি-ই শঙ্কর, শম্ভু, শিব। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে এই দেবতা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলে সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হইবে এবং তুষ্ট হইলে জগতের অসীম কল্যাণ সাধিত হইবে।

বৈদিক আর্যজাতির সহিত মোহেঞ্জোদড়োর আর্যেতর অথবা অনার্য জাতির সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণের ফলে বৈদিক সভ্যতার সকল স্তরেই পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনের ফলে মোহেঞ্জোদড়োর (পশুপতি) মুদ্রায় চিত্রিত দেবতার সহিত বৈদিক রুদ্র-শিবের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া পৌরাণিক এবং লৌকিক শিবের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, শিবের কাহিনীতে দুইটি স্পষ্ট বিপরীত চরিত্র ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের একটি আর্য এবং অপরটি অনার্য-ধর্ম হইতে আসিয়াছে। আর্যদের ধর্ম ধ্যান-ধারণা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ; ইহাতে কঠোর সংযমের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু অনার্যদিগের ধর্মসম্বন্ধে ঋগ্বেদে কটূক্তি করা হইয়াছে। ইহাদিগকে ধর্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মন-প্রাণ দিয়া প্রকৃতির সহজ ও স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করা। "আর্যেরা ছিল মনোধর্মী অর্থাৎ চিন্তাশীল, আদর্শবাদী, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, সংযমনিষ্ঠ ও অধ্যাত্মপরায়ণ। আর অনার্যেরা ছিল প্রাণধর্মী অর্থাৎ ক্রিয়াশীল, বাস্তববাদী, ভোগলিপ্সু ও দৈবনিষ্ঠ। আর্য ও অনার্যের দেবতা যখন এক হইয়া গিয়াছে তখনও সেই দেবচরিত্রে আর্য ও অনার্যের বিশিষ্ট ভাবধারার ছাপ পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে। শিব যখন মনোধর্মী আর্যের দেবতা তখন তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ, সতীপতি, উমাধব ; আর যখন তিনি প্রাণধর্মী অনার্যের দেবতা তখন তিনি ভোলানাথ, গঞ্জিকাধুস্তুরসেবী, উচ্চ নীচ ভেদহীন, আভিজাত্য গর্ববিরহিত।"

শৈবধর্মকে প্রাচীনতম লোকধর্মের অন্যতম বলা যাইতে পারে। কাজেই বাঙলা-সাহিত্যেও শৈবধর্ম লইয়া গ্রন্থরচনা সর্বাগ্রে হইয়াছিল বলিতে হয়। এই সাহিত্যের কোনও প্রমাণ আমরা পাই নাই ; তবে ইহা অনুমান করিবার মত

দু'একটি উপাদান আছে। এখানে 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবচন এবং 'শিব ঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যে দান'—ছড়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল রচনা কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই ; তবে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে ইহারা অনার্য-ধর্মী লৌকিক কাহিনী লইয়াই রচিত হইয়াছিল।

শৈবধর্ম লইয়া বাংলা মঙ্গল কাব্যের যে শাখা গঠিত হইয়াছে তাহাকে শিবায়ন বলা হয় (শিব + অয়ন = যাহা হইতে শিবের জ্ঞান অধিগম্য হয় ?)। শিবায়ন-গ্রন্থ সকল যে সময়ে রচিত হইয়াছিল তখন বাংলা দেশ পুরাণপ্রভাবিত ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম শাসিত। তাই ইহাদের মধ্যে শিবের ঐ দুই প্রকার বিভিন্ন-ধর্মী চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। দুই প্রকার কাহিনীর পার্থক্য এত প্রকট যে ইহাদের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে না। ইহারা কেবল ইহাদের উৎপত্তির দুইটি উৎসের কথাই সপ্রমান করিয়া দেয়।

শিবের কাহিনী অতি প্রাচীন হইলেও এই দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে কোনও স্বতন্ত্র কাব্য রচিত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ১৬৭৪-৮৯ সালের মধ্যে চট্টগ্রামবাসী দুইজন কবি এক মৃগ ও লুব্ধের (ব্যাধের) কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে শিব চতুর্দশীর ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম কবি রতিদেব এবং দ্বিতীয় কবি রামরাজা বা রামরায়। এই দুই কবির বিষয়বস্তু এক এবং উভয়ের ভাব ও ভাষার সাদৃশ স্পষ্ট। শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় এই গ্রন্থ দুইটি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি এই দুই কবির তুলনামূলক যে সমালোচনা তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়াছেন, তাহা হইতে উভয়ের রচনার দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল —

এমত ভাবিয়া ব্যাধ বুঝিলেক মনে।	দেবতার চরিত্র বুঝিতে পারে কোনে।
আচম্বিত মহা বৃষ্টি হইল ততক্ষণে॥	অকস্মাৎ বায়ুবৃষ্টি কৈলো মঘবানে॥
বড়কায় গাছ উপাড়িয়া পড়িল ভূমিত।	ঘরে গেলো দিনমণি রজনী প্রবেশ।
কালাবর্ণ মেঘ সব আকাশে পূর্ণিত॥	ঘোর অন্ধকার রাত্রি চাপিলো বিশেষ॥
শীতে ভীতে কম্পমান হইল শরীর।	অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত শিলা বরিষণ।
ভয়াকুল হইয়া ব্যাধ কান্দিতে লাগিল॥	আকাশ ভরিল হৈলো মেঘের গর্জন॥
বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জন।	বড় বড় বৃক্ষসব বাতাসে ভাঙ্গিলো।
মুষল সমান ধার হইল বরিষণ॥	ঠাঠাঘাতে বজ্রাঘাতে ভুবন কম্পিলো॥
ঠাঠারের ঘাত্র অগ্ন পড়ে নিরন্তর।	ঘন ঘন বিজুলি চমকে চারি পাশ।
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর॥	চাহিতে চমকে আখি জীবন নৈরাশ॥
—রামরাজার মৃগলুব্ধ সংবাদ	—রতিদেবের মৃগলুব্ধ

এই সপ্তদশ শতাব্দী হইতে শিবায়ন কাব্য রচনা আরম্ভ হইলেও ইহা অনেক দিন ধরিয়া চলে নাই। সকল কাব্যের মধ্যেই মাহাত্ম্য প্রচারক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইতে থাকায় স্বতন্ত্র আকারে শিবের কাহিনী রচনার সার্থকতা দেখা যায় না। এইজন্য শিবায়ন কাব্য অত্যন্ত কম।

মেদিনীপুর জেলার যত্নপুর নিবাসী রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত শিবায়নই একমাত্র সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্যের আকারে রচিত হইয়াছিল। এই শিবায়নটি ১৬৩২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

রামেশ্বর কবি অপেক্ষা ভক্তই ছিলেন অধিক। তাই তাঁহারা অনুপ্রাস দুষ্ট কাব্যের মধ্যেও রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হয় নাই। কবি বিশেষ করিয়া হাস্য রসের অবতারণায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। কিন্তু এ সকল অপেক্ষাও আর এক বিষয়ে রামেশ্বরের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের কাহিনীর অশ্লীলতা এবং গ্রাম্যতাকে তিনি এরূপ নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন যে তাঁহার কাব্য সুরুচির পরিচয় দেয়। নিম্নে রামেশ্বরের প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল :—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ, পঞ্চমুখ পতি।
তিনজনে একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার।
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
খিদ দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥

সুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে॥
কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হয়ে যা॥
মূষগ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখারে দেই শিখিধ্বজ কয়।
* * *
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥

রামেশ্বরই শিবায়ন-শাখায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার পরে আর যে সকল শিবায়ন রচিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। ইহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্রের শিবায়ন একটি। ইহার যে পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম তিনটি পাতা না থাকায় কবির পরিচয় ও কাব্যের রচনা কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে তাঁহাকেও অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া রাম রাম দাস রচিত শিবমাহাত্ম্যের একখানি পুঁথি রংপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিজ কবিচন্দ্র নামের ভণিতাযুক্ত একখানি শিবমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচনা কাল ১৬৫৩-৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অনেকে মনে করেন যে এই কবি মল্লভূমি-নিবাসী মুনিরাম চক্রবর্তীর পুত্র শঙ্কর, কারণ

ইনিও কবিচন্দ্র উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং শিবমঙ্গলে মল্লরাজ বীরসিং দেবের কথা উল্লেখ আছে। অনেকে ইহা স্বীকার না করিয়া লইলেও এরূপ অনুমানের যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

দ্বিজ হরিহরের পুত্র দ্বিজ মণিরাম বা দ্বিজ সুন্দর 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইহার রচনা কাল কাব্যে উল্লিখিত হয় নাই, পুঁথির লিপি কাল ১২১০ সাল।

৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে দ্বিজ ভগীরথের শিবগুণ মাহাত্ম্য নামক কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

বাংলা শিবায়ণ-গ্রন্থ সমূহে শিবের মূল কাহিনীটি এইরূপ :—

দেবসভায় মহাদেব শ্বশুর দক্ষকে সম্মান করেন নাই। ইহাতে অপমানিত হইয়া দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; কিন্তু সতী পিতৃগৃহে যজ্ঞের কথা শুনিয়া বিনা নিমন্ত্রণে শিবের নিষেধ অমান্য করিয়া সেখানে গেলেন এবং পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিলেন। শিব রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করিলেন। দক্ষ ছাগমুণ্ড ধারণ করিয়া কোনও রকমে বাঁচিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার রাজপ্রাসাদ শ্মশানে পরিণত হইল।

সতী হিমালয় কন্যা গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিলেন। শিব ছিলেন নিঃস্ব। ভিক্ষান্নে কোনরূপে সংসার চালাইতেন। এই দারিদ্র্য গৌরীর বুকে বড়ই বাজিতে লাগিল।

গৌরীর প্রশ্নের উত্তরে একদা শিব তাঁহাকে জানাইলেন যে ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে যদি কেহ উপবাস করিয়া বিল্বপত্র-সহযোগে তাঁহার পূজা করে তবে সে মোক্ষ লাভ করিবে, কারণ শিব ইহাতে পরম তৃপ্তিলাভ করেন।

দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গৌরী মহাদেবকে চাষ করিতে পরামর্শ দিলেন, কারণ দেবাদিদেব হইয়া চাকুরী করা ভাল দেখায় না। শিব অনিশ্চিত ফলের জন্য পরিশ্রম করিতে নারাজ হইলেন; কিন্তু অর্থাভাবে অন্য কিছু করা সম্ভব নয় বলিয়া মর্তে গিয়া চাষ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

ইন্দ্রের নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লইয়া বিশ্বকর্মার নিকট হইতে লাঙল লইয়া এবং কুবেরের নিকট হইতে বীজ ধার করিয়া চাষ আরম্ভ করিলেন। পৃথিবী শস্য সম্ভারে ভরিয়া উঠিল, শিবের দারিদ্র্য ঘুচিল।

শিব চাষ লইয়া মর্তেই রহিয়া গেলেন, কৈলাসে যাইবার নাম করিলেন না। এদিকে পার্বতি ব্যস্ত হইলেন; নারদের পরামর্শে তাঁহাকে আনিবার বহু চেষ্টা

করিলেন। কিন্তু একে একে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। শেষে পার্বতী বাগ্‌দিনীর বেশে শিবের ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে ধান ভাঙিতে ও মাছ ধরিতে লাগিলেন। শিব বাগ্‌দিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার বাসনা জানাইয়া তাহার সহিত মাছ ধরিতে লাগিলেন। বাগ্‌দিনী তাঁহার নিকট হইতে প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ পিতলের অঙ্গুরী লইলেন এবং কৈলাসে চলিয়া গেলেন। মহাদেবও তাহার পিছনে পিছনে কৈলাসে ছুটিলেন।

কৈলাসে পার্বতী বাগ্‌দিনীকে অঙ্গুরী দিবার অপরাধে শিবকে ঘরে আসিতে দিলেন না। নারদের পরামর্শে স্বামীকে চিরদিন বশে রাখিবার মানসে তাঁহার নিকট শাঁখা পরিতে চাহিলেন। শাঁখা কিনিয়া দিবার সঙ্গতি শিবের নাই; অভিমানে পার্বতী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন।

নারদ দুই পক্ষেই আছেন; এখন তিনি শিবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিব শাঁখারী সাজিয়া হিমালয়ে গেলেন। সেখানে তখন দুর্গাপূজা; পার্বতী শাঁখা দেখিয়া উল্লসিত হইলেন ও স্বামীকে এই ছদ্মবেশ সত্ত্বেও চিনিলেন এবং শাঁখার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শিব ইহার মূল্য আত্মসমর্পণ জানাইলে পার্বতী তাঁহাকে পরনারীর প্রতি আসক্তি এবং অঙ্গুরীদানের জন্য অনন্ত নরকভোগের কথা বলিলেন। শিব ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিলেন যে, যে নারী স্বামীকে বৃদ্ধ, জড়, মূর্খ, অপদার্থ জানিয়াও একান্তভাবে তাঁহার সেবা করে, সে-ই প্রকৃত পক্ষে সতী।

পার্বতীর মনে অনুশোচনা দেখা দিল। যাঁহার স্বামী জগৎপূজ্য দেবাদিদেব মহাদেব, তিনি স্বামীকে দারিদ্র্যের জন্য লাঞ্ছনা দিয়াছেন ভাবিয়া পার্বতীর হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন; মিলনে সকল বিবাদের শেষ হইল, হর-পার্বতী কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন।

শিবের এই কাহিনীর মধ্যে বহু উপকাহিনী পরবর্তী কালে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল উপকাহিনীকেও পৌরাণিক এবং লৌকিক আখ্যা দেওয়া যায়। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করিবার পর শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মাদের ন্যায় ত্রিভুবন মথিত করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বিষ্ণু তখন সৃষ্টি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সুদর্শন চক্রের আঘাতে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিলেন। দেহটি ৫২ খণ্ড হইয়া ৫২টি বিভিন্ন স্থানে গিয়া পড়িল এবং এক একটি পীঠস্থানের সৃষ্টি করিল। এই সকল পীঠস্থানের মাহাত্ম্যও শিয়ায়ন সাহিত্যে আড়ম্বর সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কাহিনীটি অর্বাচীন উপপুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

শিবচতুর্দশীর উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছিল যে বারাণসীর এক ব্যাধ অন্ধকার রাত্রে বনমধ্যে পথ হারাইয়া এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করে এবং নিদ্রিত হইলে ভূতলে পড়িয়া হিংস্র প্রাণীর হস্তে প্রাণ হারাইবার আশঙ্কায় সারারাত্র একটি-একটি করিয়া বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিতে থাকে। অজানিতে শিবলিঙ্গের মস্তকে এই বিল্বপত্র পড়িয়াছিল বলিয়া সে মুক্তিলাভ করে। এই কাহিনীটি ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে আমরা দেখি যে, হস্তিনানগরীর শিবভক্ত রাজা মুচুকুন্দ ও রাণী রুক্মিণী শিবচতুর্দশীর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য রাত্রি জাগরণ করিবার সময়ে রাণী রাজাকে ঐ ব্যাধকাহিনী বলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রের বিদ্যাধর চিত্রসেন ইন্দ্র-সভায় নৃত্য করিতে করিতে মর্তের এক ব্যাধের হরিণ শিকার দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া তাল ভঙ্গ করে। ফলে মর্তে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিতে সে অভিশপ্ত হয়। চিত্রসেনের কাতরতায় দয়াপরবশ হইয়া ইন্দ্র বলেন—শাপগ্রস্ত ভদ্রসেন ও রত্নাবতী মৃগ-মৃগীরূপে মর্ত্যে বিচরণ করিতেছে ; তাহাদের সহিত সাক্ষাৎলাভ হইলে তুমি মুক্তি পাইবে।

এইভাবে কাহিনীটি আরম্ভ হইয়া চিত্রসেনের শিকার, শিবচতুর্দশীর সারারাত্র জাগিয়া বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অজ্ঞাতে শিবের তুষ্টি সম্পাদন এবং ফল স্বরূপ পরদিবস মৃগরূপী ভদ্রসেনের সহিত সাক্ষাৎ, মৃগীরূপিণী রত্নাবতীর নিকট তত্ত্বকথা শ্রবণ, এবং অবশেষে চন্দ্রভাগা নদীতীরে স্নানান্তে শিবপূজা করিয়া মুক্তিলাভে শেষ হইয়াছে।

মুচুকুন্দ রাজারও এক কাহিনী অর্বাচীন উপপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই, ইহাকেও শিবের পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

শিবের লৌকিক কাহিনীগুলিতে সর্বদাই রুচি-বিগর্হিত ভাব দেখা যায়। শিবের পরনারী-সঙ্গ, অশ্লীল রসিকতা, ব্যাভিচার, প্রভৃতির জন্য সেগুলির আলোচনা অসঙ্গত হইবে।

শিবই বাংলার সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় দেবতা। পরবর্তীকালে অন্যান্য লৌকিক দেবতার আবির্ভাব হইলে যখন শিবের প্রাধান্য চলিয়া গেল তখন শিব-কাহিনীর কোন-না-কোন অংশ সেই সকল দেবতাদের কাহিনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া গেল। তাই আমরা ধর্মমঙ্গল, শূন্য পুরাণ, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, প্রভৃতিতে শিবের উল্লেখ পাই। ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপ্রকরণে শিবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। শূন্যপুরাণে শিবের কৃষিকার্য সম্পাদনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

এসকল ছাড়া আদ্যের গম্ভীরা, শিবের গাজন, প্রভৃতি লৌকিক উৎসব শিবের

কাহিনী লইয়াই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গৌরীকে গৃহে আনিবার চেষ্টায় শাঁখারীর বেশে তাঁহাকে শাঁখা পরাইবার জন্ত শিবের হিমালয়ে আগমনের যে কাহিনী আমরা পূর্বে পাইয়াছি, তাহা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে এক অপূর্ব বাৎসল্য রসমণ্ডিত হইয়া আগমনী গানরূপে দেখা দিয়াছে। শিব বাঙালীর ঘরের দেবতা। তাই প্রত্যেক বাঙালী মাতাপিতা নিজ কন্যাকে ভাগ্যবতী শিবজায়া গৌরী মনে করিয়া দুর্গোৎসবের সহিত তাহার পিতৃগৃহে আগমন এক করিয়া ফেলিয়াছে এবং আগমনী-গানে হৃদয়ের বিরহ-ব্যথা প্রকাশ করিয়াছে। তাই এ গানগুলি বাঙালীর জাতীয় সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য

বপ্যটের রণকুশল পুত্র গোপাল ছিন্ন-ভিন্ন, বিক্ষিপ্ত বঙ্গদেশকে এক অখণ্ড রাজ্যে পরিণত করিয়া শাসন ও শৃঙ্খলা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। গোপালের বংশধরগণ কয়েকপুরুষ ধরিয়া বাঙলা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশ পাল রাজবংশ নামে পরিচিত। এই পাল বংশের পূর্বে বাঙলা দেশের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্মের মর্যাদা লাভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বাঙলাদেশে বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে বাঙালার ধর্ম বলিতে বৌদ্ধ-ধর্মকেই বুঝাইত।

পাল রাজগণের পর যখন সেন রাজবংশ বাঙলা দেশের অধীশ্বর হইল তখন বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধান্যেরও অবসান ঘটিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের ফলে আবার বাঙলা দেশে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে হিন্দুগণ যে নবপ্রেরণা লাভ করিল, তাহারই ফলে তাহারা বৌদ্ধগণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল। মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে নাড়িয়া বা নেড়া নামে অত্যন্ত ঘৃণার সহিত অভিহিত করিয়া সভ্য সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে লাগিল। নিরুপায় বৌদ্ধগণ সমাজের এক অন্ধকার কোণে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাঙলাদেশে এক সময়ে আর্যেতর অথবা বৈদিক ক্রিয়াকর্মের গণ্ডীর বহির্ভূত অনার্যদিগের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। আর্যগণের চাপে পড়িয়া ইহারা লোকালয় হইতে দূরীভূত হইলেও আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। আর্য সমাজের বাহিরে ইহারা

নিজেদের এক সমাজ গঠন করিয়া বাঘ, সাপ, গাছ, পাথর প্রভৃতি স্থূল পদার্থের পূজা করিত। উৎপীড়িত বৌদ্ধগণ ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া আত্মগোপন করিল বটে, কিন্তু আত্মবিস্মৃত হইল না। এই সকল গাছ পাথরের পূজার সহিত তাহাদের ধর্ম মিশ্রিত করিয়া এমন আকারে আত্মপ্রকাশ করিল যে ব্রাহ্মণগণ পর্যন্ত উহাকে চিনিতে পারিলেন না। বৌদ্ধধর্মের কঠোরতা অনেক পরিমাণে শিথিল হইলেও আর্যেতরদিগের পূজা এক-একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি লাভ করিল এবং প্রত্যেকের উপযোগী শাস্ত্র ও সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া ইহাদিগকে ধর্মের মর্যাদা দান করিল। রাঢ়দেশে এইরূপ একটি বহু-আকার-বিশিষ্ট শিলাকে ধর্মঠাকুর বলা হয়। এই ধর্মঠাকুরের বিগ্রহ সাধারণতঃ লোকালয়ের বাহিরে কোনও গাছের তলায়, কোন কোন ক্ষেত্রে গর্তের মধ্যে কূর্মাকৃতি, অথবা শালগ্রামশিলার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকিতে দেখা যায়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ইহার মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব কোথায়?

রাঢ়ে ধর্মঠাকুরের যে 'গাজন' বা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণতঃ বৈশাখী পূর্ণিমায়ই হয়। এই তিথি বুদ্ধদেবের জন্ম, সিদ্ধি ও মহানির্বাণের তিথি। কাজেই, এই ঠাকুর-রূপী ধর্মের সহিত বুদ্ধদেবের একটা মুখ্য বা গৌণ সম্বন্ধ থাকা নিতান্ত অসম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ময়ুরভঞ্জরাজ্যে প্রাপ্ত ধর্মঠাকুরের বলিয়া প্রচারিত যে মূর্তিগুলি আছে তাহাতে ঠাকুর কখনও পুরুষ কখনও স্ত্রী। পুরুষরূপী-ধর্ম সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আর স্ত্রীরূপী ধর্ম সম্ভবতঃ বৌদ্ধদিগের ত্রিশরণ (বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ) ধর্ম, কারণ ইহাকে স্ত্রীরূপেই কল্পনা করা হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই ধর্মঠাকুরের 'সিংহলে বহুত সম্মান'। ইহা তো সোজাসুজি বৌদ্ধধর্মকেই বুঝাইতেছে। ধর্মঠাকুরের পূজায় চূণের ব্যবহারও ইহার বৌদ্ধ সম্পর্কই সূচিত করিতেছে। যে ধর্মঠাকুর বেদের নিন্দা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধদেব।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে ধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে, এগুলি যেন বৌদ্ধ বিহারের আকৃতির অনুকরণে গঠন করা হইয়াছে। প্রকাশ্যভাবে বৌদ্ধ সংঘ বা বিহার পরিচালনায় জনসাধারণের নিকট হইতে বাধা পাইয়া বৌদ্ধগণ ইঁহাকে ধর্মঠাকুরের শিলামূর্তির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করিলেন।

এই সকল যুক্তি হইতে আমরা ইহা নিসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারি যে ধর্মঠাকুরের সহিত বৌদ্ধধর্মের নিকট সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন

ভাবে আছে বলিয়াই বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত দুর্দিনেও আত্মগোপন করা এত সহজ হইয়াছিল।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় ধর্মমঙ্গল শাখারও বিশিষ্ট সাহিত্য আছে; অধিকন্তু ইহাদের বিশদ পূজাপদ্ধতির বিবরণী-পুস্তকও আছে। এই গ্রন্থটি শূন্য পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে বটে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত সংস্করণটি রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি নামে পরিচিত হইলেও, গ্রন্থকার রামাই পণ্ডিত ইহাকে আগম পুরাণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থে ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতিই বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ-সন্তান রামাই ধর্মঠাকুরের পূজার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন বলিয়া পতিত হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ডোমের পুরোহিত বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ধর্ম-মঙ্গলের লেখকের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী-ই প্রসিদ্ধ; তিনি জাতিনাশের আশঙ্কায় ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তনে ভীত হইয়াছিলেন। শেষে দেবাদেশে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ঘোষণাদ্বারা ব্রাহ্মণগণের ক্রোধকে অগ্রাহ্য করিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কাজেই, দেখা যাইতেছে যে ধর্মঠাকুরের পূজা এবং পূজারী উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাতে ধর্মপূজা প্রচারের কোনও বিঘ্নই ঘটে নাই। ইহার কারণ ধর্মমঙ্গলকাব্যে বর্ণিত কাহিনী।

মঙ্গলকাব্য শাখায় যতগুলি কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সর্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক। ইহাতে আদর্শ চরিত্র চিত্রন যেরূপ হৃদয়গ্রাহী, সেরূপ অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। লাউসেনের ন্যায় আদর্শ ভক্ত, কালু ডোমের ন্যায় বীর, কর্পূরের ন্যায় বঞ্চক, হরিহরের ন্যায় ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ, লখাই ডোমনীর ন্যায় বীরাঙ্গনা বাঙলার কোনও প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। ইহাদের অপূর্ব কীর্তিকলাপের মধ্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াই এই সকল চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঠাকুরও পাঠকের চিত্ত জয় করিতে পারিয়াছিলেন; হেয়, অবজ্ঞেয় অবস্থা হইতে সমাজের মধ্যে একটা স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাই ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তীকালে সমাজের সকল স্তরের লোকের মধ্যে একটা মিলনের সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ধর্মপূজায় সমবেত ইতর-ভদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল পরস্পরের সুখ-দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একটা স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক পাতাইয়া ঐক্যবন্ধনের দ্বারা সমাজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল।

ধর্মপালের অপদার্থ পুত্র তখন গৌড়েশ্বর। ব্যক্তিত্বহীন এই রাজাকে শিখণ্ডীর ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া প্রধান মন্ত্রী মাহুত্থা বা মহামদ নিজের ইচ্ছামত শাসনকার্য চালাইতেছিল। একদিন গৌড়েশ্বর হস্তীপৃষ্ঠে নগরভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার বিশ্বস্ত প্রজা সোম ঘোষ মন্ত্রীর চক্রান্তে কারারুদ্ধ হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দিলেন এবং কর্ণসেনের উপর তাহাকে অজয় নদের তীরবর্তী ত্রিষষ্ঠীর গড়ের সামন্তরাজ নিযুক্ত করিলেন। সোম ঘোষ পুত্র ইছাইকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে কর্ণসেন মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

এখানে থাকিয়া ইছাই শরীর চর্চা এবং অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। যৌবনকালে ইনি যে অসীম বিক্রমের অধিকারী হইলেন তাহাতে কয়েকজন মাত্র অনুচরের সাহায্যে কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া নিজেই গড়ের মালিক হইলেন এবং ঢেকুর নামক স্থানটি সুরক্ষিত করিয়া সেখানে বসবাস করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে গৌড়েশ্বরের কর্মচারী কর আদায়ের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রাজস্ব প্রদানে অস্বীকার হইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

ইহাতে অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর ইছাই-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তিনি ঢেকুর আক্রমণ করিলে ইছাই-এর বিক্রম এবং কৌশলে পরাজিত হইলেন। কর্ণসেনের ছয় পুত্র এই যুদ্ধে নিহত হইল, পুত্রবধূরা সহমরণে গেল এবং রাণী শোকাবেগে আত্মহত্যা করিলেন।

কর্ণসেন শোকে পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রঞ্জার ভ্রাতা রাজমন্ত্রী মহামদ তাহার আদরের ভগ্নীর সহিত বৃদ্ধের বিবাহ অনুমোদন করিল না। গৌড়েশ্বর রাণীর সহিত যুক্তি করিয়া মহামদকে অন্যত্র পাঠাইয়াদিলেন এবং বিবাহ সম্পন্ন করিয়া কর্ণসেনকে সামন্তরাজ নিযুক্ত করিয়া ময়না নগরে প্রেরণ করিলেন। মহামদ ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদের মুখদর্শন করিবে না প্রতিজ্ঞা করিল।

কিছুদিন পরে ভ্রাতার সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া রঞ্জা বহু অনুনয় বিনয় করিয়া কর্ণসেনকে গৌড়ে যাইতে স্বীকৃত করিলেন। কিন্তু গৌড়েশ্বরের রাজসভায় মহামদ ভগ্নিপতিকে অপমান করিল এবং ভগ্নিকে সন্তানহীনা বলিয়া বিদ্রূপ করিল। ভ্রাতার আচরণে ক্ষুব্ধা রঞ্জা পুত্র লাভের জন্য বহু ঔষধাদি ব্যবহার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। শেষে রামাই পণ্ডিতের পরামর্শে ধর্মঠাকুরের প্রসাদ লাভের জন্য নানাবিধ কৃচ্ছ্র সাধন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অনিচ্ছাসত্বেও কর্ণসেন সম্মতি দিলেন এবং রঞ্জা শালে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া ধর্মঠাকুর বিশেষ প্রীত হইলেন;

ধর্মের বরে রঞ্জা জীবন ফিরিয়া পাইলেন এবং যথা সময়ে লাউসেন নামক এক সুন্দর পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন।

এদিকে ভগ্নির পুত্র-প্রসবের সংবাদে কংস-মাতুল মহামদ বিচলিত হইল এবং ভাগিনেয়কে হরণ করিবার জন্য এক চোর প্রেরণ করিল। পুত্র হারাইয়া রঞ্জা শোকাভিভূত হইলে ধর্মঠাকুর কর্পূরবিন্দু হইতে এক পুত্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহার শোক দূর করিলেন ; এই পুত্রের নাম হইল কর্পূরসেন। এদিকে ধর্মঠাকুরের নির্দেশে হনুমান চিলের রূপ ধরিয়া চোরের কবল হইতে লাউসেনকে উদ্ধার করিয়া আনিল। রঞ্জা লাউসেন ও কর্পূর ধবলসেন পুত্রদ্বয়কে লইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমে পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার সময় আসিলে ধর্মঠাকুর হনুমানকে পাঠাইয়া সকল প্রকার বিদ্যাতেই ইহাদের সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। একদিন দেবী পার্বতী লাউসেনের চরিত্রবল পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে জয়খড়্গ পুরস্কার দিলেন। এই সময় স্বীয় বীর্য দেখাইয়া গৌড়েশ্বরের নিকট পুরস্কার লাভের ইচ্ছায় লাউসেন গৌড়ে যাইবেন স্থির করিলেন। বহু কষ্টে পিতা মাতার অনুমতি লাভ করিয়া কর্পূরের সহিত লাউসেন রওনা হইলেন ; কিন্তু মহামদ সংবাদ পাইয়া তাহাদের গৌড়ে আসা নিবারণের জন্য আটজন মল্লকে পাঠাইল। মল্লগণ তাহার হাত পা ভাঙিয়া পঙ্গু করিতে আসিলে লাউসেন অতি সহজেই তাহাদিগকে পরাজিত করেন।

গৌড়ের পথে ইহাদের নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কামদল নামক ভীষণাকার বাঘকে এবং এক অতিকায় কুমীরকে বধ করিয়া দুই ভাই জামতিতে প্রবেশ করেন। এখানকার বারুই স্ত্রীর অসৎ ষড়যন্ত্রে অসম্মত হইলে নয়ানী নামক একজন আপন পুত্রকে কূপে ফেলিয়া দিয়া রাজদ্বারে লাউসেনের নামে পুত্রহত্যার অভিযোগ করে। লাউসেন কারারুদ্ধ হইলেও ধর্মঠাকুরের কৃপায় মৃত পুত্রের মুখ দিয়া সত্য ঘটনা প্রকাশ করাইয়া মুক্তি পাইলেন। গোলাহাট নামক স্ত্রীরাজ্যের দুষ্টবুদ্ধি স্ত্রীগণের রাণী সুরিক্ষার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন তাহার সকল হেঁয়ালীর উত্তর দিলেন এবং শেষে হনুমানের সহায়তায় তাহাকে অপমান করিলেন।

এই ভাবে গৌড়ে পৌছাইয়াও লাউসেন নিস্তার পাইলেন না। মহামদের চক্রান্তে চৌর্যাপরাধে তাঁহার কারাবাস হইল। কিন্তু এখানে ধর্মঠাকুরের কৃপায় যুদ্ধে রাজহস্তীকে বধ এবং পুনরায় জীবন দান করিয়া মুক্তিলাভ করেন। মহামদের চক্রান্ত ধরা পড়িয়া যায়। শেষে গৌড়েশ্বরকে বৃক্ষধ্বংস এবং পুনর্জীবন দেখাইয়া

আপন পরিচয় জ্ঞাপন করেন। গৌড়েশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব বাছিয়া লইতে বলিলে তিনি ইন্দ্রের পক্ষীরাজটিকে চিনিতে পারিয়া গ্রহণ করেন এবং ময়না তালুক পাইয়া ইহারা দেশে ফিরিলেন। পথে কালুডোম, তাহার স্ত্রী লখ্যা এবং তাহাদের পুত্র পরিজনদিগের সহিত পরিচয় হইল ; লাউসেনের অনুরোধে তাহারা ময়নায় বসবাস স্থাপন করিল।

লাউসেন গৌড় হইতে ফিরিয়া গেলে মহামদ তাহাকে নূতন বিপদের মধ্যে ফেলিয়া ধ্বংস সাধনের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারই প্ররোচনায় গৌড়েশ্বর কামরূপের রাজাকে দমন করিয়া কর আদায়ের জন্য লাউসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। লাউসেনের জয়লাভ নিশ্চিত করিবার জন্য ধর্মঠাকুর হনুমানকে দিয়া গৌড়েশ্বরের মাতার নিকট হইতে জপমালা ও জয়কাটারি আনাইয়া দিলেন। ইহাদের সাহায্যে লাউসেন অতি সহজেই ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করেন এবং কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মন্দির হইতে দূর করিয়া কালুডোমের সহায়তায় অতি সহজেই কামরূপ জয় করিলেন। কামরূপের রাজা লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া কন্যা কলিঙ্গার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় মৃত সৈন্যগণকে প্রাণদান করিয়া গৌড়ে আসেন। গৌড় হইতে গৃহে ফিরিবার পথে মঙ্গলকোটের রাজা গজপতির কন্যা অমলা এবং বর্ধমানের রাজা কালিদাসের কন্যা বিমলাকে বিবাহ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর সিমুলের রাজা হরিপালের সুন্দরী কন্যা কানড়াকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু কন্যাপক্ষ এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলে গৌড়েশ্বর সসৈন্যে সিমুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কানড়া, দেবীর অনুগৃহীতা উপাসিকা ; তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য দেবী এক লৌহ গণ্ডার নির্মান করাইয়া বলিলেন যে, যে ইহার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিবে সে-ই কানড়াকে লাভ করিবে। গৌড়েশ্বর এবং মহামদ অকৃতকার্য হইলেন। তখন মহামদের পরামর্শে লাউসেনকে আনান হইল। লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় কৃতকার্য হইলে গৌড়েশ্বর তাহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া কন্যালাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সিমুল আক্রমণ করিলে কানড়া ও তাঁহার দাসী ধুমসী যুদ্ধে নামিলেন এবং দেবীর কৃপায় গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিলেন। ইতিমধ্যে লাউসেন আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে দেবীর কৃপায় কানড়া তাঁহাকে চিনিলেন এবং উভয়ের বিবাহ হইলে তাঁহারা ময়নায় ফিরিয়া গেলেন।

গৌড়েশ্বর ক্রোধান্বিত হইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন এবং লাউসেনকে অপমানিত করিবার জন্য তাহাকে ঢেকুরে ইছাই ঘোষকে দমন করিতে পাঠাইলেন। লাউসেন

ও কালুডোম অজয়ের তীরে উপস্থিত হইয়া লোহাটা সর্দারকে বধ করিলেন এবং তাহার কাটামুণ্ড গৌড়ে পাঠাইলেন। মুণ্ডটিকে মহামদ লাউসেনের মুখের মত করিয়া ময়নায় পাঠাইল। লাউসেনের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল; তাঁহার চারি পত্নী সেই মুণ্ডের সহিত অগ্নিতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ধর্মের নির্দেশে হনুমান চিলরূপে সেই মুণ্ড ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল এবং কলিঙ্গার নিকট প্রকৃত ঘটনা জানাইয়া সকলকে শান্ত করিল।

লাউসেন অজয় নদ পার হইতে গিয়া বন্দী হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ জলে ঝাঁপ দিলে ধর্মঠাকুর অজয়ের জল হাঁটুভর করিলেন এবং সকলকে উদ্ধার করিলেন। অজয়ের অপর তীরে লাউসেনের সহিত ইছাই-এর যুদ্ধ বাধিল। ইছাই দেবীর অনুগৃহীত ভক্ত; তাই লাউসেন যতবার তাহার মাথা কাটিয়া দেন, ততবারই তাহার মাথা গজাইয়া উঠে। দেবী ইছাইকে বর দিলেন যে, সে লাউসেনের প্রাণ বধ করিবে; ধর্ম মায়া-লাউসেন নির্মাণ করাইয়া দিলেন। এদিকে দেবতারা ষড়যন্ত্র করিয়া দেবীকে মহেশের কাছে লইয়া গেলেন; ইছাইএর উপর তাঁহার দৃষ্টি না থাকাতে লাউসেন তাহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন এবং বিষ্ণু তাড়াতাড়ি সেই মুণ্ডকে মুক্তি দিলেন। কাজেই দেবী আর ইছাইকে পুনর্জীবন দান করিতে পারিলেন না। সোম ঘোষ গৌড়েশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিল। লাউসেন গৌড় হইয়া ময়নায় ফিরিলেন।

লাউসেনের চিত্রসেন নামে এক পুত্র জন্মিল এবং তিনি সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে মহামদের অনাচারের ফলে গৌড়ে বর্ষা ও প্লাবন আরম্ভ হইল; কিন্তু লাউসেন গিয়া তাহা প্রশমিত করিলেন।

এবার লাউসেনকে পশ্চিমে সূর্যোদয় করাইতে বলা হইল। তিনি অকৃতকার্য হইলে তাঁহার পিতামাতাকে বধ করা হইবে বলিয়া গৌড়ে বন্দী করিয়া রাখা হইল। লাউসেন শাফুলাকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে হাকন্দে গিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে লাগিলেন।

এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ ময়না অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিল। কালুকে লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিয়া মহামদ মন্ত্রবলে সকলকে নিদ্রিত করিয়া ময়না অধিকার করিতে উদ্যত হইলে লখ্যা একাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। একে একে তাহার পুত্রগণ নিহত হইলে সে কালুকে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইল। কালু নিহত হইলে কলিঙ্গা যুদ্ধে গেলেন। তিনি নিহত হইলে কানড়া ধুমসী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহামদকে পরাজিত করিলেন।

এদিকে লাউসেন কঠোরভাবে ধর্মপূজা করিতেছেন। মহাবিদ্যা জপ করিতে

করিতে শরীরের মাংস কাটিয়া হোম করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া শাকুলার পরামর্শে লাউসেন নিজ মস্তক কাটিয়া অগ্নিতে দিলেন। তখন ধর্ম প্রসন্ন হইয়া তাঁহার জীবন দান করিলেন এবং পশ্চিমে সূর্য্যোদয় করাইলেন। লাউসেন হরিহর বাইতিকে সাক্ষী রাখিয়া গৌড়ে আসিলেন।

মহামদ প্রলোভন দেখাইয়া হরিহরকে বশীভূত করার চেষ্টা করিল; কিন্তু ধর্মের ভয়ে হরিহর রাজ সভায় সত্য সাক্ষই দিল। মাতা পিতা ও ভ্রাতার সহিত লাউসেন দেশে ফিরিলেন। ধর্মের কৃপায় কলিঙ্গা, কালু, প্রভৃতি জীবন পাইল।

এদিকে মহামদ চুরির অপবাদে বাইতিকে শূলে দিল। কিন্তু ধর্মের কৃপায় বাইতি সশরীরে স্বর্গে গেল। মহামদের অশেষ পাপের জন্য তাহার কুষ্ঠ হইল। লাউসেন ধর্মের কৃপায় তাহার রোগ সারাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহার দুষ্কর্মের জন্য মুখে একটি চিহ্ন রহিয়া গেল।

এইভাবে মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করিয়া লাউসেন সপরিবারে স্বর্গে গেলেন। চিত্রসেন ময়নায় রাজত্ব করিতে লগিলেন।

পরবর্তী কবিগণ যাঁহাকে আদি কবির সম্মানিত আসন দিয়াছেন, ময়ূরভট্টকেই ধর্মমঙ্গল-শাখার প্রথম কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার গ্রন্থের নাম ছিল হাকন্দ পুরাণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ময়ূরভট্টের যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকে নানাবিধ কারণে আধুনিক বলিয়াই মনে হয়। কাজেই উহা ময়ূরভট্ট-রচিত আদি গ্রন্থ নহে। এই জন্য কবির আবির্ভাব-কাল অজ্ঞাত রহিয়াছে।

ময়ূরভট্টের পরবর্তী যে সকল কবির গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে খেলারাম অন্যতম। অন্যান্য কবিদের মত ইনি আত্ম পরিচয় দেন নাই বলিয়া আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। তবে রচনা কাল ১৪৪৯ শকাব্দ—১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ জানা গিয়াছে।

বীরভূমের বোলপুরে শ্যাম পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবির কাব্যের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা বৈশিষ্টবর্জিত বলিলেই চলে।

রূপরাম তাঁহার কাব্যে পাণ্ডিত্যই বেশী দেখাইয়াছেন, কাব্যে সরসতা থাকিলেও সরলতার একান্ত অভাব। রূপরাম বর্ধমান জেলার অধিবাসী ইহা যেমন সুনিশ্চিত, তাঁহার রচনাকালও তেমনই অনিশ্চিত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুমানে ইনি ১৬০৪—০৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামের কবি সীতারাম ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি। গ্রন্থ

বর্ণিত শ্লোকে জানা যায় যে তাঁহার রচনাকাল ১০০৪ সালে—১৬৯৮—৯৯। সীতারামের রচনা সরল হইলেও ইহাতে কবিত্ব বা পাণ্ডিত্য নাই; প্রচলিত কাহিনীর গতানুগতিক অনুসরণেই তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল।

হুগলী জেলার কৈবর্ত-কুলোদ্ভব কবি রামদাস আদক ১৫৮৪ শকাব্দ = ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে অনাদিমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ প্রতাপ নারায়ণ ইঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রামদাসের কাব্যেও বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট নাই।

বর্ধমান বিষ্ণুপুরের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্নের কাব্য নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৬৩৩ শকাব্দে—১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন। সহজ কবিত্বের সহিত পাণ্ডিত্য মিশ্রিত হইয়া ঘনরামকে ধর্মমঙ্গল শাখার শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দান করিয়াছেন। ঘনরাম তাঁহার কাব্যে প্রবাদ-বাক্য এবং উদ্ভট শ্লোক ব্যবহার করিয়া বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন।

হুগলী-রাধানগরের কবি সহদেব চক্রবর্তীর কাব্যে লাউসেনের কাহিনী নাই; অথচ ইহাতে হরগৌরী, মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কবি ১১৪১ সাল—১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। সহদেবের গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয় যে তিনি কতকগুলি প্রচলিত কাহিনী একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র, একটি সমগ্র কাব্য সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

চামট-গ্রাম নিবাসী দ্বিজ রামচন্দ্র ১৭৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁহার গ্রন্থে পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু কাব্য নাই।

বর্ধমান শাঁখারী নিবাসী নরসিংহ বসু ১৬৫০ শকে—১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এক সুবৃহৎ কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। নরসিংহ সুপণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার কাব্য কোথাও পাণ্ডিত্যের চাপে নষ্ট হয় নাই, ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব।

এই শাখার আর একজন কৃতী কবি মাণিক গাঙ্গুলী হুগলী আরামবাগের অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ইঁহার যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার রচনাকাল নির্দেশক শ্লোকের সহিত অন্যান্য পুঁথির পাঠ মিলাইয়া ইহার রচনাকাল ১৭০৩ শক—১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। মাণিক তাঁহার কাব্যে কাহিনীর বীররস যেমন সুন্দর ফুটাইয়াছেন, তেমনই ইহার মধ্যে আদি রসের সমাবেশ সুষ্ঠু ভাবেই করিয়াছেন। কবি স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া কাব্যে ভক্তি ভাবেরও প্রাধান্য দিয়াছেন। মোট কথা, সকল দিক হইতেই মাণিকরামের কাব্য সরস, চিত্তাকর্ষক এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও এই শাখার দ্বিজ ক্ষেত্রনাই, হৃদয়রাম সাউ, গোবিন্দরাম, রামনারায়ণ, নিধিরাম, প্রভৃতির কাব্য রচিত হইয়াছিল।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত আর একটি গ্রন্থ আছে যাহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইয়াছে। গ্রন্থটি বর্তমানে 'শূন্য পূরাণ' নামে প্রচলিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে এই গ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ইহাকে 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি' বলা হইয়াছে। স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ই ইহাকে 'শূন্য পুরাণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন; অথচ গ্রন্থ মধ্যে ভনিতায় ইহার নাম পাই 'আগম পুরাণ'। গ্রন্থকর্তা সম্বন্ধেও নানা প্রকার মতানৈক্য দেখা যায়। অধিকাংশের মতে গ্রন্থটি ১৩শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন কবির রচনা একত্রিত করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে।

পূরাণ বা মঙ্গল কাব্যের যে সংজ্ঞা আমরা পাইয়াছি তদনুযায়ী বিবেচনা করিলে ইহাকে পুরাণ অথবা মঙ্গল কাব্য বলা যায় না। তাহা ছাড়া ইহা পূজা-পদ্ধতি বা পূজা-জ্ঞাপক গ্রন্থও নহে। প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থকে তিন ভাগ করা যায়ঃ—(১) সৃষ্টি খণ্ড বা দেবতা খণ্ড; (২) সংজতি খণ্ড বা লাউসেন রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্র সাধনের কাহিনী। রচনাকার রূপে সর্বত্রই রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে।

'শূন্য পুরাণে' একটি কৌতুকজনক পদ আছে, যাহা অবশ্য সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থেও পাওয়া যায়। পদটি এইরূপ—

জাজপুর পুরবাসী   ষোল শঅ ঘর বসি
বসিল যে কেবল দুর্জন।
দক্ষিণা মাগিতে যায়   যার ঘরে নাহি পায়
শাপ দিয়া পোড়ায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর   না চিনে আপন পর
জালের নাহিক দিশপাশ।
বলিষ্ট হইয়া বড়   দশ বিশ হইয়া জড়
সদ্ধর্মীরে করয়ে বিনাশ॥
বেদ করে উচ্চারণ   বাহিরায় অগ্নি ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনে ত পাইয়া মর্ম   সভে বোলে রাম ধর্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ॥
এইরূপে দ্বিজগণ   করে সৃষ্টি সংহরণ
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম   মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার॥

ধর্ম হইলা যবনরূপী   মাথায়েত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান ;
চাপিয়া উত্তম হয়   ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার   হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখে ত বলয়ে দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ   সভে হয়্যা একমন
আনন্দে তো পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ   বৈষ্ণু হৈলা পেগাম্বর
আদম্ফ হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল গাজী   কার্তিক হইল কাজী
ফকির হইল যত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক   নারদ হইলা শেখ
পুরন্দর হইল মলানা !
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে   পদাতিক হয়্যা সেবে
সবে মিলি বাজায় বাজনা ॥
আপনি চণ্ডিকাদেবী   তিঁহ হৈলা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল বিবি নূর।
যতেক দেবতাগণ   হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে   ক্যাড়্যা ফিড়্যা যায় রঙ্গে
পাথড় পাথড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পায়   রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥

কাজেই, ধর্মঠাকুর-সংক্রান্ত হইলেও শূন্য পুরাণকে আমরা মঙ্গলকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। নানা প্রমাণ দেখিয়া ইহা একই ব্যক্তির রচনা নহে বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়।

চণ্ডী মঙ্গল কাব্য

চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই দেবী যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবী তাহা জোর করিয়া বলা যায় না, কারণ মঙ্গল কাব্যে তাঁহার যে সকল কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক কাহিনী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেবীর স্তবেই কেবল তাঁহার অসুর বধ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই, ধর্মঠাকুরের মত এই দেবীকেও যে পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে, এবিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নাই।

কাহিনীতে সমুদ্রবক্ষে 'কমলেকামিনীর" যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত ভাবধারা সম্পূর্ণরূপেই বৌদ্ধ এবং এই প্রসঙ্গে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহাও ধর্মমঙ্গলের ন্যায় বৌদ্ধ ভাবাপন্ন।

কিন্তু এখানেই ইহার আরম্ভ হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়;—কালকেতু ব্যাধের বৃত্তান্ত এবং ধনপতি সদাগরের বৃত্তান্ত। কালকেতু নিজেকে "গো-হিংসক রাঢ়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং তাহার দেবীও বরাহ-বলী গ্রহণ করেন। এই দুইটি প্রাণীই আর্যধর্মে অচল। কাজেই, চণ্ডীদেবীর মধ্যে আর্যেতর দেবীর কিছু অংশ থাকাও বিচিত্র নহে। মহেন্-জো-দড়োর দেবদেবীর সহিত পশুগণ যুক্ত থাকায় ইহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধের সম্ভাবনা দেখা যায়। পৌরানিক চণ্ডীর সিংহবাহন ছাড়া আর কোনও পশুর সহিত সম্পর্ক দেখা যায় না; কাজেই এ চণ্ডী অহিন্দু। তবে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের দু একটি দেবীর পশু-সংসর্গ আছে এবং ইহা বৌদ্ধ প্রভাবও বলা যাইতে পারে।

এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে অপর কোনও মঙ্গলকাব্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী লইয়া রচিত হয় নাই, চণ্ডীদেবীর কেন তাহা হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল উদার সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের প্রসার রোধ করিবার জন্য এবং বর্ণাশ্রমধর্মী হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে। বর্ণহিন্দুরা এতদিন যাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিল, সমাজের পরিপুষ্টির জন্য তাহাদিগকে ধর্মগণ্ডীর মধ্যে আনিবার উদ্দেশ্যে দেবদেবীরও যে তাহাদের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি আছে তাহা প্রমাণ করার প্রয়োজন হইল। কাজেই, বর্ণহিন্দু ধনপতিকে যে দেবী কৃপা করেন, তিনিই আবার আর্যেতর ব্যাধ কালকেতুকে বরদানে কৃতার্থ করেন। সমাজপতি ব্রাহ্মণেরাই যখন স্বয়ং এই কথা প্রচার করিলেন, তখন তাহারা সমাজের

একটা বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। দুর্গাদেবীর সহিত অন্যান্য ধর্মের দেবীকে যুক্ত করিয়া হিন্দুসমাজকে ব্যাপক করা হইল।

চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; নানাদিক দিয়া বিচার করিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকে অমূল্য বলা যাইতে পারে।

কালকেতুর কাহিনীতে পাই যে চণ্ডীদেবীর মর্ত্যে নিজ পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বামী মহাদেবকে ছলনা করিয়া ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে শাপ দেওয়াইলেন। ফলে সে ব্যাধপুত্র কালকেতুরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হইতেই ইহার শারীরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; রূপে, গুণে মনোহর এই বালকের সহিত সুন্দরী ফুল্লরার বিবাহ হয়।

যৌবনকালে কালকেতু যখন শীকার করিয়া জীবিকা অর্জন আরম্ভ করিল তখন বনের পশুগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল; তাহার বিক্রমে ভীত হইয়া পশুগণ চণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। চণ্ডী তাহাদের অভয় দিলেন এবং ফলে কালকেতু আর শীকারের সাক্ষাৎ পাইলেন না। একদিন শীকারে বাহির হইয়াই একটি গোসাপ দেখিল এবং এই অযাত্রা দেখার পর শীকার লাভের আশা ছাড়িয়া ইহাকে ধনুকে বাঁধিয়া বনে প্রবেশ করিল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরিয়া শীকার না পাইয়া বাড়ী ফিরিল এবং ফুল্লরাকে তাহা ছাড়াইয়া রাঁধিতে বলিয়া বাসি মাংস বিক্রয়ের আশায় বাজারে গেল।

এদিকে ফুল্লরা সখীর বাড়ী হইতে কিছু চাল ধার করিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া দেখিল যে একটি সুন্দরী যুবতী উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফুল্লরা যখন জানিল যে তাহার স্বামীই তাহাকে আনিয়াছেন, তখন নানা আশঙ্কায় তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে তাহাকে স্বগৃহে ফিরিবার জন্য নানা ভাবেই প্ররোচিত করিল; কিন্তু কোনও ফল হইল না দেখিয়া স্বামীকে ডাকিতে গেল।

বিস্মিত কালকেতু ঘরে ফিরিয়া সেই সুন্দরীকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল। ফুল্লরার ন্যায় নিজ গৃহে ফিরিবার নানা প্ররোচনা দিয়া ব্যর্থ হইয়া সে ক্রোধান্বিত হইল এবং ধনুকে শর জুড়িল। তখন সুন্দরী দশভূজা মূর্তি ধারণ করিলেন এবং সাতঘড়া মোহর ও একটি অঙ্গুরী দিয়া তাহাদিগকে নগর পত্তন করিতে বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

কালকেতু গুজরাটের বন কাটাইয়া নগর পত্তন করিল এবং রাজার ন্যায় সেখানে বাস করিতে লাগিল। ভাঁড়ু দত্ত নামক এক শঠ নানা স্তোকবাক্যে

চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই দেবী যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবী তাহা জোর করিয়া বলা যায় না, কারণ মঙ্গল কাব্যে তাঁহার যে সকল কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক কাহিনী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেবীর স্তবেই কেবল তাঁহার অসুর বধ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই, ধর্মঠাকুরের মত এই দেবীকেও যে পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে, এবিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নাই।

কাহিনীতে সমুদ্রবক্ষে 'কমলেকামিনীর" যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত ভাবধারা সম্পূর্ণরূপেই বৌদ্ধ এবং এই প্রসঙ্গে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহাও ধর্মমঙ্গলের ন্যায় বৌদ্ধ ভাবাপন্ন।

কিন্তু এখানেই ইহার আরম্ভ হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়;—কালকেতু ব্যাধের বৃত্তান্ত এবং ধনপতি সদাগরের বৃত্তান্ত। কালকেতু নিজেকে "গো-হিংসক রাঢ়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং তাহার দেবীও বরাহ-বলী গ্রহণ করেন। এই দুইটি প্রাণীই আর্যধর্মে অচল। কাজেই, চণ্ডীদেবীর মধ্যে আর্যেতর দেবীর কিছু অংশ থাকাও বিচিত্র নহে। মহেন্-জো-দড়োর দেবদেবীর সহিত পশুগণ যুক্ত থাকায় ইহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধের সম্ভাবনা দেখা যায়। পৌরানিক চণ্ডীর সিংহবাহন ছাড়া আর কোনও পশুর সহিত সম্পর্ক দেখা যায় না; কাজেই এ চণ্ডী অহিন্দু। তবে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের দু একটি দেবীর পশু-সংসর্গ আছে এবং ইহা বৌদ্ধ প্রভাবও বলা যাইতে পারে।

এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে অপর কোনও মঙ্গলকাব্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী লইয়া রচিত হয় নাই, চণ্ডীদেবীর কেন তাহা হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল উদার সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের প্রসার রোধ করিবার জন্য এবং বর্ণাশ্রমধর্মী হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে। বর্ণহিন্দুরা এতদিন যাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিল, সমাজের পরিপুষ্টির জন্য তাহাদিগকে ধর্মগণ্ডীর মধ্যে আনিবার উদ্দেশ্যে দেবদেবীরও যে তাহাদের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি আছে তাহা প্রমাণ করার প্রয়োজন হইল। কাজেই, বর্ণহিন্দু ধনপতিকে যে দেবী কৃপা করেন, তিনিই আবার আর্যেতর ব্যাধ কালকেতুকে বরদানে কৃতার্থ করেন। সমাজপতি ব্রাহ্মণেরাই যখন স্বয়ং এই কথা প্রচার করিলেন, তখন তাহারা সমাজের

একটা বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। দুর্গাদেবীর সহিত অন্যান্য ধর্মের দেবীকে যুক্ত করিয়া হিন্দুসমাজকে ব্যাপক করা হইল।

চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; নানাদিক দিয়া বিচার করিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকে অমূল্য বলা যাইতে পারে।

কালকেতুর কাহিনীতে পাই যে চণ্ডীদেবীর মর্ত্যে নিজ পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বামী মহাদেবকে ছলনা করিয়া ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে শাপ দেওয়াইলেন। ফলে সে ব্যাধপুত্র কালকেতুরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হইতেই ইহার শারীরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; রূপে, গুণে মনোহর এই বালকের সহিত সুন্দরী ফুল্লরার বিবাহ হয়।

যৌবনকালে কালকেতু যখন শীকার করিয়া জীবিকা অর্জন আরম্ভ করিল তখন বনের পশুগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল; তাহার বিক্রমে ভীত হইয়া পশুগণ চণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। চণ্ডী তাহাদের অভয় দিলেন এবং ফলে কালকেতু আর শীকারের সাক্ষাৎ পাইলেন না। একদিন শীকারে বাহির হইয়াই একটি গোসাপ দেখিল এবং এই অযাত্রা দেখার পর শীকার লাভের আশা ছাড়িয়া ইহাকে ধনুকে বাঁধিয়া বনে প্রবেশ করিল। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরিয়া শীকার না পাইয়া বাড়ী ফিরিল এবং ফুল্লরাকে তাহা ছাড়াইয়া রাঁধিতে বলিয়া বাসি মাংস বিক্রয়ের আশায় বাজারে গেল।

এদিকে ফুল্লরা সখীর বাড়ী হইতে কিছু চাল ধার করিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া দেখিল যে একটি সুন্দরী যুবতী উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফুল্লরা যখন জানিল যে তাহার স্বামীই তাহাকে আনিয়াছেন, তখন নানা আশঙ্কায় তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে তাহাকে স্বগৃহে ফিরিবার জন্য নানা ভাবেই প্ররোচিত করিল; কিন্তু কোনও ফল হইল না দেখিয়া স্বামীকে ডাকিতে গেল।

বিস্মিত কালকেতু ঘরে ফিরিয়া সেই সুন্দরীকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল। ফুল্লরার ন্যায় নিজ গৃহে ফিরিবার নানা প্ররোচনা দিয়া ব্যর্থ হইয়া সে ক্রোধান্বিত হইল এবং ধনুকে শর জুড়িল। তখন সুন্দরী দশভূজা মূর্তি ধারণ করিলেন এবং সাতঘড়া মোহর ও একটি অঙ্গুরী দিয়া তাহাদিগকে নগর পত্তন করিতে বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

কালকেতু গুজরাটের বন কাটাইয়া নগর পত্তন করিল এবং রাজার ন্যায় সেখানে বাস করিতে লাগিল। ভাঁড় দত্ত নামক এক শঠ নানা স্তোকবাক্যে

তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ঐ রাজ্যের মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিল। কালকেতু ইহাতে অস্বীকৃত হইলে সে কলিঙ্গরাজের নিকট গিয়া নানারূপ মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিল। কলিঙ্গরাজের আক্রমণে কালকেতু পরাজিত এবং বন্দী হইল, কিন্তু চণ্ডীদের নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ পাইয়া কলিঙ্গরাজ তাহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

কালকেতু রাজত্ব ফিরিয়া পাইয়া চণ্ডীর পূজা প্রচার করিল এবং শাপান্তে স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে পাই যে রত্নমালা নামে অপ্সরা একটা তাল ভঙ্গ করার অপরাধে অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্যের এক বণিকের গৃহে খুল্লনা নামে জন্মগ্রহণ করে এবং ঘটনাক্রমে খুড়তুত বোন লহনার স্বামী ধনপতি সদাগরের সহিত তাহার বিবাহ হয়।

বিবাহের পর রাজার আদেশে ধনপতিকে গৌড়দেশে যাইতে হয়। ধনপতির নির্দেশমত লহনা খুল্লনার খুব আদর করিতে লাগিল; কিন্তু অল্পদিন পরেই দুর্বলা নামক কুটিলা দাসীর প্ররোচনায় লহনা খুল্লনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল এবং তাহাকে স্বামীর চক্ষে বিষ করিতে নানা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। শেষে একদিন ধনপাতির জাল চিঠি দেখাইয়া তাহাকে ছাগল চরাইতে, ঢেঁকিশালে শয়ন করিতে একবেলা আধপেটা আহার করিতে এবং খুঁয়া বস্ত্র পরিতে বাধ্য করিল।

বনের মধ্যে ছাগল চরাইতে গিয়া একদিন খুল্লনা ঘুমাইয়া পড়িল। তখন চণ্ডীদেবী তাহাকে স্বপ্ন দিলেন যে, তাহার 'সর্বশী' নামক ছাগলটিকে শিয়ালে খাইয়াছে। লহনার তিরস্কারের ভয়ে বনে ছাগল খুঁজিতে খুঁজিতে খুল্লনার সহিত দেবকন্যাদের সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাদের পরামর্শে সে চণ্ডীদেবীর পূজা করিল। দেবী তাহাকে দেখা দিয়া স্বামীপুত্র লাভের বর দিলেন। লহনাও দেবীর স্বপ্ন পাইয়া খুল্লনাকে পুনরায় যত্ন করিতে লাগিল; ওদিকে গৌড়ে অবস্থানকালে ধনপতি স্বপ্নে স্ত্রীদের দেখিয়া চঞ্চল হইয়া গৃহে ফিরিল।

সেদিন বহুলোক ধনপতির গৃহে সমবেত হইল। ধনপতি খুল্লনাকে আহার্য প্রস্তুত করিতে বলিল। লহনার আপত্তি সত্ত্বেও খুল্লনাই রাঁধিল এবং চণ্ডীর কৃপায় তাহা খাইয়া সকলে পরিতৃপ্ত হইল।

ইহার পর ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে মালা-চন্দন দিয়া কুলশ্রেষ্ঠকে সম্মান জানাইবার সময়ে মতান্তর ঘটিল এবং ফলে গণ্ডগোল বাধিল। যাহারা ধনপতির বিপক্ষে ছিল তাহারা এই সুযোগে খুল্লনার বনে ছাগল চরাইবার জন্য তাহার সতীত্বে সন্দেহ

প্রকাশ করিল ঃ হয় ইহার কঠিন পরীক্ষা কিংবা ধনপতি লক্ষ টাকা জরিমানা না দিলে কেহই তাহার গৃহে আহার করিবে না বলিল।

ধনপতি টাকা দিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু লহনার প্ররোচনায় তৎপরিবর্তে খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার আয়োজন হইল। খুল্লনা জলে ডুবিল না, আগুনে পুড়িল না। তখন সকাল নীরব হইল।

ইহার কিছুদিন পরে রাজার আদেশে ধনপতিকে অশুভ দিনেই সিংহলযাত্রা করিতে হইল। শিব-ভক্ত ধনপতিকে লহনা জানাইল যে খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করিতেছে; যাত্রার পূর্বে ধনপতি দেবীর ঘটে পদাঘাত করিল। সমুদ্রবক্ষে দেবী ইহার প্রতিশোধ লইলেন; ধনপতির ছয় ডিঙা ডুবিল। সে কোনও রকমে একটি ডিঙায় সিংহলে চলিল। পথে দেবীর মায়ায় ধনপতি দেখিল যে সমুদ্রবক্ষে এক পদ্মফুলের উপরে এক কামিনী বসিয়া একটি গজ কেবলই গ্রাস করিতেছে ও পুনরায় তাহা বমন করিতেছে।

সিংহলে পৌছাইয়া রাজাকে কমলেকামিনী দর্শনের কাহিনী বলাতে তিনি অবিশ্বাস করিলেন। ধনপতি অঙ্গীকার করিল যে সে দেখাইতে না পারিলে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবে এবং পারিলে অর্ধেক রাজত্ব পাইবে। চণ্ডীর ছলনায় বিফল হইয়া ধনপতি কারাগারে অবরুদ্ধ হইল।

এদিকে মালাধন নামক গন্ধর্ব শিব কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্তরূপে জন্মগ্রহণ করিল। ক্রমে বড় হইয়া পাঠশালায় পড়িতে গেলে একদিন গুরুমহাশয় তাহার জন্ম সম্বন্ধে কটুক্তি করিলেন। শ্রীমন্ত সকলের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া পিতার সন্ধানে সিংহলযাত্রা করিল। সাগরবক্ষে সে-ও কমলেকামিনী দেখিল এবং সিংহলে পৌছাইয়া রাজাকে বলিল। অবিশ্বাসের সহিত রাজা বলিলেন যে সে যদি তাঁহাকে ইহা দেখাইতে পারে, তবে তিনি তাহাকে অর্ধেক রাজত্ব ও কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন; আর না পারিলে শ্মশানে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিবেন।

চণ্ডীদেবী শ্রীমন্তকেও ছলনা করিলেন। ফলে রাজার লোকেরা তাহাকে শ্মশানে ধরিয়া লইয়া গেল। এখানে শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিলে দেবী সেখানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার অনুচর ভূত-প্রেতদিগের প্রহারে রাজার সৈন্যেরা পলাইল। চণ্ডীর কৃপায় সিংহলরাজ কমলেকামিনী দেখিলেন এবং ফলে ধনপতির সহিত শ্রীমন্তের মিলন হইল।

ধনপতি চণ্ডীর কৃপায় তাহার নষ্ট সম্পদ ফিরিয়া পাইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা

করিল। পথে উজানী নগরের রাজাকে কমলেকামিনী দেখাইয়া তাঁহার কন্তা জয়াবতীকে বিবাহ করিল।

তারপর শাপান্তে সকলে স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাই, ইহা তাহার আদি রূপ নহে। ছড়া বা ব্রতকথার মত অতি ছোট আকারেই ইহার আরম্ভ হইয়াছিল এবং কালের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আকার বাড়িতে বাড়িতে শেষে মুকুন্দ রামের হাতে ষোলপালার একটা পরিণত কাব্য-রূপ লাভ করে। কিন্তু এই শাখার প্রথম বা আদি কবি কে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপযুক্ত প্রমাণাদি নাই। অনেকে দ্বিজ জনার্দনকেই আদি কবির সম্মান দিয়া থাকেন। জনার্দনের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহা খণ্ডিত; ইহা হইতে কবির রচনাকাল পাওয়া যায় না। তবে ইহা একটা ছোট-খাট ব্রতকথার ন্যায় এবং ইহার ভাষাও ২৫০।৩০০ বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে। এইজন্য জনার্দন প্রাচীনতম না হইলেও প্রাচীন কবিদের অন্যতম বলা যাইতে পারে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে আমরা পাই—

মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়॥
বন্দি নুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।

কাজেই মুকুন্দরাম তাঁহার পূর্ববর্তী দুইজন কবির বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। মানিক দত্তের স্বল্পপরিসর যে চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কবির রচনাকাল নাই; বাসস্থান মালদহের ফুলুরা গ্রাম। কবির রচনা বিশেষত্বহীন না হইলেও ইহাকে সাহিত্য বলা যায় না।

শ্রীকবিকঙ্কণ হইতেছেন মাধবাচার্য চক্রবর্তী। কবি যে আত্মবিবরণী দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে তিনি ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন। আকবর বাদশাহের রাজ্যে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর নিকটের গঙ্গাতটে তাঁহার বাসভূমি ছিল। মাধব প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম; তাঁহার কাব্যে চরিত্র চিত্রণের মধ্যে যে রস সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বাস্তবিক মুগ্ধকর। মাধব চণ্ডীকাব্যের যে রূপ দিয়াছেন তাহাই পরবর্তী কবিদের আদর্শস্থল। তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে:—

দধিথান লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন।
মৎস্যের পসারে গিয়া দিল দরশন॥

মাছোনী বসিছে মৎস্যের পসার লৈয়া কোলে।
পসার হোতে মৎস্য ভাঁড়ু বাছি বাছি তোলে॥
মৎস্য ধরিয়া ডোমনীএ পাড়ে টানাটানি।
কড়ি না দিয়া মৎস্য লইয়া যাও কেনি॥
ভাঁড়ু দন্তে বোলে ডোম বলিএ তোমারে।
এত কাল্ল মৎস্য বেচ কর দেহ কারে॥
ডোমনীএ বোলে ভাড়ু তুমি হও কে।
করের লাগি ধরিবেক জো আতি হ এ যে॥
এই মুখে তুম্মি আম্মার মৎস্য খাইবা।
মোর সঙ্গে এখনে বীরের স্থানে যাইবা॥
গালাগালি বাজিল বহুল হুড়াহুড়ি।
কোমরে থাকিয়া তার পড়ে ভাঙ্গা কড়ি॥

সকল দিক দিয়া বিচার করিলে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। বর্ণনার বৈচিত্র্যে, চরিত্রসৃষ্টির মাধুর্যে দামুন্যার কবিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে মুকুন্দরামের কাব্যে বীরচরিত্রের একান্ত অভাব। কালকেতু বাল্যকালে এবং যৌবনে শিকারের সময়ে যে বীরত্ব দেখাইয়াছিল, শত্রুর ভয়ে ধানের গোলার মধ্যে লুকান তাহার পক্ষে উপযুক্ত নহে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে মুকুন্দরাম যে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন, তাঁহার কৃপা ছাড়া কাহারও কোনও শক্তিই কার্যকরী হইবে না, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। কমলে-কামিনীর গজভক্ষণও সৌন্দর্যবোধের অভাবে ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন ; কিন্তু মুকুন্দরামের অন্য পথ ছিল না ; বর্ণনাকে শাস্ত্রসম্মত করিতে তিনি গজভক্ষণের উল্লেখ করিতে বাধ্য।

মুকুন্দরামের আত্মবিবরণী হইতে জানা যায় যে তিনি ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ আরম্ভ করেন এবং ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা সমাপ্ত করেন। জন্মভূমি দামুন্যা সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

কুলে শীলে নিরবদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামন্যায় সজ্জনের স্থান।
অতিশয় গুণ-বাড়া সুধন্য দক্ষিণ পাড়া
সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥
ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নানু নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।

ধরি চক্রাদিত্য নাম দামন্যা করিলা ধাম
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর ॥
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব দেউল দিল বৃষদত্ত
কতকাল তথায় বিহার।
কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া
বরদান করিয়া সঞ্চার ॥
গঙ্গাসম সুনির্মল তোমার চরণজল
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে ॥

কবির কাব্য তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত থাকায় তাহা আরও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। ডিহিদার মামুদ সারিফের উজির রায়জাদা নামক ব্যক্তির অত্যাচারে কবিকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; কবি স্ত্রীপুত্র লইয়া অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে গিয়া রাজার আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তাই কালকেতুর শীকারের অত্যাচারে জর্জরিত পশুগণ যখন চণ্ডীদেবীর নিকট নিজ নিজ দুঃখ কষ্ট নিবেদন করিতেছে, তখন আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এই করুণ বিলাপ যেন কবির নিজের। পশুগণ চণ্ডীদেবীকে বলিতেছে—

উইচার খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক ॥
সাতপুত্র বীর মারে বান্ধি জাল পাশে।
সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে ॥

কবির আত্মবিবরণীর—

শিশু কাঁদে ওদনের তরে ॥

আমাদের মনে পড়িয়া যায়।

জীবনে এত দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও কিন্তু কবির হাস্যকৌতুক শুকাইয়া যায় নাই। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে—

ভেট লয়ে কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ুদত্তের পয়ান।
ফোঁটাকাটা মহাদন্ত ছিঁড়া জোড়া কোঁচা লম্ব ॥
শ্রবণে কলম খরসান ॥

প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায় খুড়া খুড়া।
ছিঁড়া কম্বলে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥

মুকুন্দরামের পরেও অনেক কবি চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া আসর জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামবাসী মুক্তারাম সেন ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাকে একটি উন্নত ধরণের পাঁচালি বলা যায়। তাঁহার ভ্রাতা ব্রজলালের গ্রন্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী অবলম্বনে রচিত।

দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রামাণিকতায় অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। তাঁহার রচনা প্রায় মাধবাচার্য্য এবং কবিকঙ্কণের অনুরূপ; ইহাতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে কালকেতুর কাহিনীর পরিবর্তে হরিহোড়ের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীশঙ্কর দাস জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত রচনা করেন; ইহা সংস্কৃত শব্দে ভারাক্রান্ত। কবির সমাস গঠনের প্রতি একটি অহেতুক প্রীতি দেখা যায় এবং হইলোৎপত্তি = হইল উৎপত্তি প্রভৃতি হাস্যকর সমাসের দৃষ্টান্তে গ্রন্থটি পরিপূর্ণ।

শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গলম মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুসরণে লিখিত হইলেও কালকেতুর উপাখ্যান ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও, কৃষ্ণজীবন মোদক, হরিশচন্দ্র বসু, হরিনারায়ণ দাস, রায়শঙ্কর দেব, বনদুর্লভ, জগন্নাথ, লালা জয়নারায়ণ প্রভৃতি রচিত বিভিন্ন নামের চণ্ডীমাহাত্ম্য প্রচারক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

মনসা-মঙ্গল কাব্য

মানুষের ধর্ম সম্পর্কীয় ইতিহাসে দেখা যায়, যাহা হইতে তাহার মনে ভয় অথবা বিস্ময়ের উদ্রেক হইত, তাহাকেই সে দেবতা জ্ঞান করিত এবং নিজের কল্যাণ কামনায় তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে নানা উপচারে তাহার পূজা করিত। এই সময়ে যেমন একদিকে মেঘগর্জন, বজ্রপাত ও বারিবর্ষণ তাহার বিস্ময় জাগাইয়াছিল, তেমনি অপরদিকে ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী তাহার মনে ভয়ের উদ্রেক করিয়াছিল

বৃষ্টি হইলে তাহার কৃষিকার্যের সুবিধা হইত ; তাই ইহার অভাব হইলেই সে বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করিয়া জল প্রার্থনা করিত। আবার ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতির অতর্কিত আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাদের দেবতাজ্ঞানে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া তুষ্ট করিত। প্রাচীন কালে এই যে পূজার রীতি আরম্ভ হইয়াছিল তাহা অদ্যাবধি অব্যাহত রহিয়াছে। পূজাপদ্ধতি স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হইলেও মানুষের মন হইতে ভক্তি-শ্রদ্ধার সেই মূলভাব দূর নাই।

প্রমাণ হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে মোহেন-জো-দড়োতে যে ধ্বংস স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্প-পূজার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মোহেন জো-দড়োর সভ্যতাকে আনুমানিক ২৫০০-৩০০০ বৎসরের প্রাচীন বলা হইয়াছে। কাজেই, সর্পপূজাকেও অতি প্রাচীন বলিতে হয়। ইহাও দেখা যাইতেছে যে কোল, ভীল প্রভৃতি ভারতের আদিম আর্যেতর অধিবাসীদের মধ্যে সর্প-পূজা এখনও প্রাচীন স্থূল পদ্ধতিতেই প্রচলিত রহিয়াছে।

কাজেই মনে হয় যে আর্যেতর জাতির মধ্যে প্রচলিত সর্পপূজা পরবর্তীকালে আর্যধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়া সংস্কৃত হয় এবং উহার উন্নত ধরণের পূজা পদ্ধতি সর্বসাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করে। এরূপ অনুমানেরও যথেষ্ট কারণ আছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলেন যে কানাড়া অঞ্চলে 'মনে মঞ্চম্মা' নামক যে সর্প দেবতার পূজা প্রচলিত আছে তাঁহার পূজা-মন্দিরকে মঞ্চীর মন্দির বলে। সেখানে মন্চা অম্মা (মন্চা মাতা) শব্দটি 'মন্সা অম্মা' রূপে উচ্চারিত হয় এবং উহাই 'মন্সা মাতা-'তে পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, যে মনসা গাছের নীচে এই মনসা দেবীর পূজা হইয়া থাকে তাহাকে তেলেগু ভাষায় চেংমুড় বলে ; চাঁদসদাগর মনসাকে চেংমুড়ি বলিয়া উল্লেখ করিতেছে দেখিয়া এই দেবীটিকে স্বভাবতই দ্রাবিড় দেশের সহিত যুক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু চেংমুড়ী বলিতে চেং মাছের মত চ্যাপটা মুড়ি বা মাথা বিশিষ্ট সর্পকেও বুঝাইতে পারে। ইহা ছাড়া, অনেক বাঙালী কবি মনসাকে 'জাগুলি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাগুলি সম্ভবতঃ বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের জাগুলিদেবী, কারণ এই দেবীর বর্ণনা মনসাদেবীরই অনুরূপ। কাজেই, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সময়ে বৌদ্ধদেবী জাগুলিটির মনসার আড়ালে আত্মগোপন করাও বিচিত্র নহে।

প্রাচীন পুরাণাদিতে মনসাদেবীর বিশেষ কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। তবে এই দেবী যে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। কারণ ঐ সময়েই নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত মনসা মূর্তি বাঙলার বহুস্থানেই পাওয়া গিয়াছে।

মনসামঙ্গল কাব্য একটি সম্পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল কাব্য ; মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত কাঠামো ইহার কাহিনী বর্ণনায় যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। তবে চাঁদসাগরের কাহিনীটি কোথা হইতে আসিল এবং ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। চাঁদসদাগরের শৌর্য এবং বেহুলার মাধুর্য ভারতবাসীকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়াছে যে কমপক্ষে ১০টি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় তাঁহাদের বাসস্থান ছিল বলিয়া দাবী করা হয় এবং চম্পা নামক নগর, চাঁদের ভিটা, বেহুলা নদী, নেতার পুকুর প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে কোনও ঐতিহাসিক সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। তবে এইটুকু নিশ্চিত যে মূল কাহিনীটির উৎপত্তি রাঢ়ে অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে হইয়াছিল, কারণ যে নদী দিয়া বেহুলা স্বামীর শব লইয়া ভাসিয়াছিল তার তীরবর্তী নগরের নাম যাহা পাই তাহার সবগুলিই ভাগীরথীর তীরবর্তী নগর।

মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত কাহিনীটিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় :— (১) পৌরাণিক—এই অংশে শিবদুর্গার কাহিনী, মনসার জন্ম, চণ্ডীর সহিত বিবাদ, মনসার বিষদৃষ্টিতে শিবের মূর্ছা, মনসার চেষ্টায় পুনরায় জ্ঞানলাভ, মনসার বিবাহ, ইত্যাদি ব্যাপার বর্ণিত ; (২) মনসার মাহাত্ম্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পূজা আদায় ; (৩) মূল কাহিনী।

মূল কাহিনীতে আমরা দেখি যে পরম শৈব (মতান্তরে চণ্ডীর উপাসক) চন্দ্রধর বা চাঁদ শিবপূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিতেছিল। সৎ-মা চণ্ডীর প্রতি ঈর্ষান্বিতা মনসাদেবী মর্ত্যে নিজের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাহাকে অকারণে শাপ দিলেন এবং সে মর্ত্যে চম্পকনগরে বিজয় সাধুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু শিবের প্রতি একাগ্র ভক্তি থাকায় সে কিছুতেই মনসার পূজা করিতে স্বীকৃত হইল না। স্বামীর মঙ্গল কামনায় চাঁদের স্ত্রী সনকা গোপনে মনসার পূজা করিত ; একদিন চাঁদ জানিতে পারিয়া পদাঘাতে পূজার ঘট ভাঙিয়া দিল এবং সনকাকে অপমান করিল।

মনসা ইহাতে ক্রোধান্বিতা হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করিলেন। চাঁদের গুয়াবাড়ী ধ্বংস হইল ; অসংখ্য আত্মীয়স্বজন সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু শিবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির জন্য সে যে দৈবজ্ঞান লাভ করিয়াছিল তাহাদ্বারা গুয়াবাড়ীর উদ্ধার সাধন করিল এবং বন্ধু ধন্বন্তরী ওঝার সাহায্যে সর্পদংশিত ব্যক্তি-বর্গকে পুনরায় জীবিত করিল। মনসা ধন্বন্তরীর প্রাণনাশ করিলেন এবং চাঁদের দৈবজ্ঞান হরণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, একে একে তাহার ছয়টি পুত্রের অন্নে বিষ মিশাইয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন।

সনকা গোপনে মানসার পূজা করিয়া পুত্র লাভ করিল বটে, কিন্তু জন্মপত্রিকায় দেখা গেল বিবাহ-বাসরেই সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে ; কারণ স্বর্গের অনিরুদ্ধ লখিন্দররূপে জন্মগ্রহণ করিল।

চাঁদ শুভলগ্নে চৌদ্দ ডিঙা ভাসাইয়া পাটন নগরে বাণিজ্যযাত্রা করিল। সেখানে প্রচুর লাভ করিয়া দেশে ফিরিবার সময়ে আত্মীয়-স্বজনের এবং মনসাদেবীর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া মনসার প্রতি দারুণ অভক্তির কথাই জানাইল। মনসার আদেশে সমুদ্রে বাণ ডাকিল এবং চৌদ্দ ডিঙা সমেত চাঁদ জলে ডুবিল। কিন্তু চাঁদ জলে ডুবিয়া মরিলে মনসার পূজা প্রচার হয় না ; দেবী তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, চাঁদ ভাসিতে ভাসিতে একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় পাইয়াও তাহা মনসার দয়া মনে করিয়া গ্রহণ করিল না। তবুও অপ্রত্যাশিত ভাবে সে কূলে উঠিল।

হৃতসর্বস্ব, অনাহারক্লিষ্ট চাঁদ দেশে ফিরিল এবং পূর্ণযৌবন পুত্রের মুখ দেখিয়া নবীন উদ্যমে আবার সংসার গঠনে মন দিল। পুত্রের বিবাহের জন্য বহু অনুসন্ধানের পর বেহুলাকে পছন্দ করিল। বিবাহবাসরে পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইবে জানিয়া তাহার জন্য লৌহবাসর নির্মিত হইল ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অদৃশ্য ছিদ্র পথে সর্প প্রবেশ করিয়া কার্য সমাধা করিল।

চারিদিকে হাহাকার পড়িল ; কিন্তু বিবাহবাসরে বিধবা বেহুলা একবিন্দু অশ্রুপাত করিল না। মৃত পতির দেহটি কোলে লইয়া গাঙ্গুরীর জলে ভেলায় করিয়া পতিকে বাঁচাইবার জন্য যাত্রা করিল। দুর্গম পথে ভয়াবহ স্থান ও অসংখ্য বিপদের মধ্য দিয়া বেহুলার ভেলা ভাসিয়া চলিল ; স্বামীর শব পচিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু বেহুলা অটল, অন্তরের পতিভক্তি তাহার হৃদয়ে আশার অনির্বাণ প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। গোদা ও আপু ডোম তাহাকে ধরিতে আসিল ; কিন্তু পতিভক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থিত বেহুলার কেশস্পর্শও করিতে পারিল না। নেতা তাহাকে বহু প্রকার পরীক্ষা করিল, কিন্তু তাহার নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল যে সে যদি সন্ন্যাসীর ঠাকুর ভাঙড় ভোলানাথকে নৃত্যে সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহা হইলে তাহার স্বামী জীবন লাভ করিবে।

ক্রমে বেহুলার ভেলা দেবপুরে প্রবেশ করিল। সেখানে মহাদেবের সম্মুখে তাহার জীবনব্যাপী সাধনার অগ্নিপরীক্ষা, তাহার নৃত্যে মহাদেব তুষ্ট না হইলে সব ব্যর্থ হইবে। মনপ্রাণ দিয়া বেহুলা নৃত্য আরম্ভ করিল ; সাধ্বী রমণীর প্রতি সুচারু পদক্ষেপের মাধুর্য মহাদেবের হৃদয় প্রীত ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। শেষে আশুতোষ তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন। বেহুলার একমাত্র প্রার্থনা—পতির

জীবন! কাজেই মহাদেব মনসাকে ডাকিলেন। মনসা তাঁহার গোঁ ছাড়িবেন না; তিনি সমস্তই করিতে প্রস্তুত যদি চাঁদ তাঁহার পূজা করে। বেহুলা এই সর্তেই স্বীকৃত হইল এবং স্বামীকে বাঁচাইয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

চাঁদের আজ আনন্দ ধরে না; তাহার সপ্ত ডিঙা ফিরিয়া আসিয়াছে, মৃত পুত্রগণ এবং আত্মীয়স্বজন জীবন ফিরিয়া পাইয়াছে। আজ তাহার গৃহ সুখ এবং ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু যে মুহূর্তে সে মনসার সর্তের কথা জানিতে পারিল তখনই বিদ্রোহী চাঁদ সদাগর আবার জাগিয়া উঠিল—'চেংমুড়ী কানীর' পূজা সে কিছুতেই করিবে না। কিন্তু সাধ্বী রমণীর পতিপরায়ণতা তাহার বজ্র-কঠোর চিত্তকে কোমল করিয়া দিল; সে মুখ ফিরাইয়া বামহস্তে মনসাকে পুষ্পাঞ্জলি দিল।

এইভাবে মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচারিত হইলে সকলে শাপান্তে স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

বাঙলা দেশে বিষধর সর্পবহুলতার জন্য অথবা মনসামঙ্গল কাহিনীর মনোহারিত্বের জন্য বেহুলার ভাসান যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, খুব অল্প কাহিনীর ভাগ্যেই সেইরূপ ঘটিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতারূপে প্রায় একশত কবির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাঙলাদেশের সর্বত্রই এই কাহিনী সমাদর লাভ করিয়াছে।

এই শাখার আদি কবি কে তাহা জোর করিয়া বলিবার মত উপাদান এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে পরবর্তীকালের দু' একজন কবি কানা হরিদত্ত নামক একজনকে আদি কবির সম্মান দিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত তাঁহার মনসামঙ্গলে লিখিয়াছেন—

প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।

পুরুষোত্তমের একটি গীতে আছে—

কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।

হরিদত্তের কাব্যের যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে তাঁহার রচনাকাল জানা যায় না তবে একটা কথা বুঝিতে পারা যায় যে, বিজয়গুপ্ত তাঁহার কাব্যে হরিদত্ত সম্বন্ধে যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক। উচ্চাঙ্গের না হইলেও হরিদত্ত নিতান্ত অকবি ছিলেন না। এই প্রাচীন কবির রচনার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাইবে—

দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগ শোভে সুন্দর কিঙ্কিনী॥

ঋখিশুয়া নাগে করিল হাতের তাড়।
কলুজিয়া নাগে কজ্জল শোভে ভাল ॥
নীল নাগে দেবী বান্দিল কেশপাশ।
অঞ্জনিয়া নাগে করে অঞ্জন বিলাস ॥

রচনা কাল জানিতে পারা যায় না এরূপ আর একজন প্রাচীন কবি হইতেছেন নারায়ণদেব। ইনি মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের বোরগ্রাম নামক গ্রামের অধিবাসী। ইহার পূর্ব্বপুরুষ রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন এবং মুসলমানগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান। রচনা দেখিয়া মনে হয় যে, ইনি ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। আসামের অধিবাসিগণ এই কবিকে তাঁহাদের দেশবাসী বলিয়া দাবী করেন এবং অসমীয়া ভাষায় তাঁহার রচিত কাব্যের নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন।

রচনা কাল সম্পূর্ণরূপে সঠিক নির্ধারিত করিতে না পারিলেও পারিপার্শ্বিক প্রমাণের বলে কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্বের মধ্যে আনা যায় পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের। এক-একটি পুঁথিতে রচনাকাল নির্দেশক শ্লোকের পাঠ এক-এক রূপ আছে বটে, কিন্তু কাব্যের মধ্যে হুসেন সাহের রাজ্যশাসনের সময় কবির আবির্ভাব ও কাব্য রচনার উল্লেখ থাকায় উহাকে ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পরবর্তীকালের কবি এবং গায়কদের সংশোধন এবং সংযোজনের ফলে বিজয়গুপ্তের কাব্যের আদি ও অকৃত্রিম রূপ এখন আর পাইবার উপায় নাই। তবে তাঁহার কাব্যের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কবি অপেক্ষা পণ্ডিত হিসাবেই বড় ছিলেন। মনসামঙ্গলের কাহিনীটি-ই মর্মস্পর্শী ; ইহাকে করুণ করিয়া বর্ণনা করার জন্যই বিজয়গুপ্ত জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন। তবে তাঁহার কাব্যে কয়েকটি প্রবাদ বাক্য দেখা যায় :—

অতি কোপে করিলে কাজ ঠেকে অথান্তর।
অতি বড় গাঙ্গ হইলে ঝাঁটে পড়ে চর ॥
যেই মুখে কণ্টক বসে সেই মুখে খসে ॥
বচনে সাগর বান্ধ পথ বাহ ছলে ॥
ডোকর হারাইয়া যেন ডোকরে বাঘিনী ॥
পাভিল জুখিয়া যেন কুমারে গড়ে সরা ॥

বিজয়গুপ্তের কাব্যে আর একটি লক্ষ্যণীয় আছে। কবি যে ছন্দ-বৈচিত্র্য

দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদিগকে ভারতচন্দ্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি॥
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে॥
আগুন লাগুক কন্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, পড়ে ভাঙ্গুক লাউ।
কপালের চন্দ্রতিলক তারে গিলুক রাউ॥

জগতে মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ॥
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচের মহাদেব মনেতে কৌতুক॥
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গে॥

২৪-পরগণার অন্তর্গত নাডুরে বট গ্রামের অধিবাসী দ্বিজবিপ্রদাস ১৪১৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একখানি সংক্ষিপ্ত কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার মধ্যেই সর্বপ্রথম কলিকাতার নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঢাকা-মহেশ্বরদির অন্তর্গত জিনারদিনিবাসী ষষ্ঠীবর ও তাঁহার পুত্র গঙ্গাদাস একখানি কাব্য রচনা করেন। ইহারা মহাভারত প্রভৃতি রচনায় যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, মনসামঙ্গল কাব্যে সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। এই কাব্যে পাণ্ডিত্য-ই আছে কাব্য একেবারে নাই।

আনুমানিক ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৈমনসিংহ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে আবির্ভূত দ্বিজবংশীদাসের মনসার ভাসান নানাকারণেই উল্লেখযোগ্য। বংশীদাস একাধারে কবি এবং ভক্ত ও সাধক ছিলেন। তাই তাঁহার কাব্যটি গভীর এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। কথিত হয় যে একবার বংশীদাস মনসার গান গাহিয়া বনপথে গ্রামে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে কেনারাম নামক হৃদয়হীন দস্যু তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিল। বংশীদাস শেষবার মনসার ভাসান গাহিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। দস্যু স্বীকৃত হইলে গান আরম্ভ হইল এবং অল্প পরেই দেখা গেল যে

কেনারাম করুণরসে এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে তাঁহার চক্ষে শতধারা বহিতেছে ; বংশীদাসের পা জড়াইয়া সে শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সৎভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিল। এই কাহিনীটি বংশীদাসের কন্যা, প্রাচীন বঙ্গের মহিলা-কবি চন্দ্রাবতী বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বারা খাঁ যখন বর্ধমান জেলার সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্তা তখন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (বা ক্ষমানন্দ) নামক এক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দুই ব্যক্তি একযোগে এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে ; কবি মনসাকে কেতকাদেবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই দাস বলিয়া নিজেকে কেতকাদাস রূপে অভিহিত করিয়াছেন। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ক্ষেমানন্দকেই মনসামঙ্গল শাখার শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে হয়। পাণ্ডিত্যের সহিত কবিত্বের, চরিত্র-চিত্রণের সহিত ভাষার মাধুর্যের এরূপ সমন্বয় আর কোনও কবির মধ্যে দেখা যায় না। আমরা তাঁহার অল্প পরিচয় দিতেছি—

আসিয়া ইন্দ্রের কাছে, বেহুলা নাচনী নাচে,
প্রাণপতি জিয়াইবে কাজে ॥
থাকি থাকি পদ ফেলে মরালগমনে চলে,
মুখ জিনি পূর্ণিমার শশী।
খদির কাষ্ঠের খোল, বেহুলার মিষ্ট বোল,
মোহ গেল যত স্বর্গবাসী ॥
একদৃষ্টে দেবগণ, করে সবে নিরীক্ষণ,
বেহুলা নাচেন সুরপুরে।
নাহি হয় তালভঙ্গ, মনে বড় লাগে রঙ্গ,
প্রমত্ত ময়ুর যেন ফিরে ॥

বগুড়ার লাহিড়ীপাড়া নিবাসী জীবন মৈত্র কবিভূষণ ১১৫১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; ইহাতে শুধু পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া, বর্ধমান জেলার কালিদাস ১৬১৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে একখানি কাব্য রচনা করেন। বীরভূম-সেহড়া নিবাসী বিষ্ণুপালেরও একখানি প্রাচীন কাব্য পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল অপেক্ষাকৃত খ্যাতনামা কবি ছাড়া মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা প্রায় ৮০ জনের কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের কাব্যগুলি সাধারণতঃ বৈশিষ্ট্যবর্জিত ;

প্রাচীন খ্যাতনামা কবিদের অনুসরণ এবং অনুকরণ মাত্র। এগুলি শুধু 'মনসা-মঙ্গল' কাহিনীর জনপ্রিয়তারই সাক্ষ্য দেয়।

কালিকা মঙ্গল-কাব্য

বিদ্যা ও সুন্দরের প্রচলিত কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া কালিকামঙ্গল কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে মূল কাহিনীর সহিত দেবী মাহাত্ম্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেরূপ একাত্ম, কালিকামঙ্গলে সেরূপ দেখা যায় না। এই শাখার কবিদের মধ্যে কেহ দেবীকে, কেহবা কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

ইহা কয়েকটি কারণেই ঘটিতে পারে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাব্য এবং ইতিহাস-সম্মত যাহা হইতে পারে তাহারই আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

শিবের সহিত শক্তিও আর্যধর্মে প্রবেশ করিয়া এক নূতন রূপ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই কালিকারূপটি বিশেষভাবে তন্ত্রোক্ত গুহ্য সাধনার অঙ্গীভূত হওয়ায় বহুদিন সর্বসাধারণ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। তাই প্রাচীন পুরাণাদিতে কালিকার বিশেষ উল্লেখ নাই। তারপর, যখন বাঙলাদেশে তান্ত্রিক সাধনা প্রসার লাভ করে, তখন কালিকা পূজাও প্রচলিত হয় এবং ভক্ত ও সাধকদিগের পরিতৃপ্তির জন্য এই দেবীরও মঙ্গলকাব্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন ভক্ত কবি একটি প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে উপাখ্যান বা কাহিনী দেবীকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া দেবীর সহিত তাহার ঘটনাবলীর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইয়াছে দেখা যায়। কালিকামঙ্গলে দেবী-ই কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া আপনার মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া সেরূপ ঘটিয়া উঠে নাই।

বাঙলা বিদ্যা সুন্দরের কাহিনীতে বিদ্যাকে বর্ধমানের রাজকন্যা বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় অনেকে ইহাকে একটি সত্য ঘটনা বলিয়া মনে করেন। ইহার মধ্যে যে কোনও ঐতিহাসিক সত্য নাই এরূপ নহে, তবে তাহা বাঙলাদেশের কোনও কাহিনী নহে! ভারতচন্দ্রই কাহিনীটিকে ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য বর্ধমান রাজ পরিবারের সহিত যুক্ত করিয়া দেন। কথিত হয় যে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কাশ্মীরি পণ্ডিত ও কবি বিল্হন গুজরাটের অনহিলপত্তনের কোনও রাজকুমারীর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চারের ফলে তাঁহারা গোপনে গান্ধর্ব বিবাহে আবদ্ধ হন। পরে রাজকুমারীর সন্তান সম্ভাবনা

হওয়াতে রাজা সমস্ত জানিতে পারিয়া বিল্হনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। বিল্হন তখন রাজাকে 'চৌর পঞ্চাশিকা' নামক পঞ্চাশটি অপূর্ব শ্লোক শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিলেন। তখন রাজা উভয়ের বিবাহ দিয়া তাহাদের রাজ্য হইতে দূরে পাঠাইয়া দিলেন। শ্লোকগুলির একটি মুখ্য ও একটি গৌণ এই দুইটি করিয়া অর্থ আছে।

ভবিষ্যপুরাণের কোন কোন সংস্করণের ব্রহ্মখণ্ডে বিদ্যা-সুন্দরের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত বলা যায়। কাজেই ইহাকে বাংলা কাহিনীর মূল বলিতে পারা যায় না। বররুচি নামক কবি সংস্কৃতে যে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন তাহা অনেক বাঙালী কবিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং অন্ততঃ একজন কবির নাম করা যায় যিনি ইহার ভাব এবং স্থলে স্থলে ভাষারও অনুকরণ করিয়াছেন ইঁন বলরাম কবিশেখর। প্রাচীন সংস্কৃত কবি ভাসের রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তার কাহিনীর সহিত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কে সর্ব-প্রথম চৌর পঞ্চাশিকার শ্লোকগুলিতে কালিকা-মাহাত্ম্য আরোপ করিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে উহার টীকাকার রাম তর্কবাগীশ তাঁহার 'কাব্যসন্দীপনী' নামক টীকার প্রারম্ভে বিদ্যাসুন্দরের যে সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণনা করেন, তাহাতেও ইষ্টদেবী কালিকা বলিয়াই কথিত। আবার মৈমনসিংহের কবি কঙ্ক বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সাহায্যে সত্যপীরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে কালিকাদেবীর সহিত বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীর যোগ-সূত্রটি অত্যন্ত ক্ষীণ। ভক্ত-কবি যাহাকে লইয়া দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে লইয়া গুপ্ত প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া অনেক কবি অশ্লীলতা এবং কুরুচির নিম্নতম শ্রেণীতে নামিয়াছেন।

কালিকামঙ্গলের লেখকদের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ অন্যতম :—

কঙ্কের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক ছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বর্ণনা করিলেও ইনি কালিকামঙ্গলের কবি নহেন, সত্যপীরের পাঁচালিকার।

দ্বিজ শ্রীধর নামক এক ব্যক্তি নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের আশ্রয়ে থাকিয়া একটি বিদ্যা-সুন্দর কাব্য রচনা করেন। ইহা ১৬শ শতাব্দীর কথা এবং ইনিই এই শাখার আদি কবি বলিয়া অভিহিত।

ভারত সম্রাট ঔরংজেবের রাজত্বকালে শায়েস্তা খাঁ যখন বাঙলার সুবাদার, তখন কলিকাতার নিকটবর্তী নিমতা-গ্রামবাসী কৃষ্ণরাম দাস বিদ্যা-সুন্দর কাহিনী

অবলম্বনে একখানি কাব্য রচনা করেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত দিয়াঙ্গের অধিবাসী গোবিন্দদাসের একটি বৃহৎ কালিকা-মঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। কবির প্রাচীনত্ব সন্দেহের বিষয়। কাব্যের বিষয়বস্তু, রচনারীতি, অথবা ভাষা ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্নের অনুকূল নহে। তবে কবি ভক্তিভাবাপন্ন বলিয়া কাব্যে দেবীর মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নারায়ণদেব রচিত কালিকাপুরাণের যে খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে কবি অথবা কাব্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

বলরাম কবিশেখরের যে কালিকামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রচনা-কাল দেওয়া নাই ঃ মোটামুটি বলা যায় যে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী এবং রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী। কবিকে পূর্ববঙ্গবাসী বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু ভাষায় তাহার কোনও নিদর্শন নাই ঃ বরং পশ্চিমবঙ্গের তীর্থস্থানাদির সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।

এক হিসাবে বলরামই কালিকামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। ভক্তি পূর্ণ হৃদয় লইয়া তিনি দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কাব্যে অশ্লীলতার নাম গন্ধ নাই ; অথচ সহজ, সরল এবং সাবলীল কাব্য সৃষ্টি হইয়াছে। কবি ঘটনা বর্ণনায় যে সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অসাধারণ—

পতি পুত্র হীনা আমিত কুদীনা
নাহি মোর অন্যজন।
তুমি পুত্র সম ইথে নাহি কম
চল মোর নিকেতন॥
বলেন সুন্দর কোনখানে ঘর
নামে হৈলে মোর মাসী।

ভারতচন্দ্র রায় কবি গুণাকর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে যে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন তাহার একাংশে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ছিল অসাধারণ ; ভাষা ও ছন্দের এরূপ অপূর্ব মিলন আর কোনও প্রাচীন কবি দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার কতকগুলি পংক্তি প্রবাদ বাক্যের মত লোকের মুখে মুখে চলিয়াছে। আমরা কয়েকটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন ॥
যতন করিলে লাভ মিলয়ে রতন ॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায়ে হাসে ॥
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥

তথাপি, অশ্লীলতার কথা বাদ দিলেও, ভারতচন্দ্রের কাব্যকে কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। ইহাতে আছে প্রচুর অলংকার শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত, ভাষা ও ছন্দের ক্রীড়া নৈপুণ্য।

কুমারহট্ট নিবাসী কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের কালিকামঙ্গল কাব্য সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের পরে রচিত হইয়াছে। কবি ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গ্রহণ করিয়াছেন বটে, তথাপি তাঁহার কাব্যের নায়ক-নায়িকাকে সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাষার দৈন্যে কবি ভারতচন্দ্রের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত বলিয়া তাঁহার এই বিদ্যা-সুন্দর কাব্য জনপ্রিয় হয় নাই। তথাপি তাঁহার রচনায় মাঝে মাঝে কাব্যের রস সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যায়!—

সহরে গুজব উঠে একে একশত।
গল্প বাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
একশরা ভরা টিকা হুঁকা চলে দুটা।
পোয়াদেড় তামাকু ঢেঁকি কুটা॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচার॥
হাত কাটা একটা মানুষ গেল কয়ে।
চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে॥
পরম রূপসী তারা স্বর্গ বিদ্যাধরী।

চট্টগ্রাম নিবাসী নিধিরাম আচার্যের কালিকামঙ্গল ১৭৫৬।৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কবি প্রচলিত কাব্য রীতির অনুকরণ করিতে গিয়া কাব্যের প্রাণহানি করিতেছেন—

খঞ্জন চকোর আর কুমুদ-কুরঙ্গ।
নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ॥
খঞ্জন উড়িয়া গেল, মৃগ বন মাঝে।
চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে॥

—ইহা গতানুগতিক "নখ শির" বর্ণনার রীতি।

প্রাণরাম চক্রবর্তীর একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে যাহাতে কবি পূর্ববর্তী কবি বলিয়া কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই, তিনি ইহাদের পরবর্তী।

ইহা ছাড়া, মধুসূদন কবীন্দ্র, ক্ষেমানন্দ ও বিশ্বেশ্বর দাসের কাব্যের উল্লেখ

পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই এবং কাব্যের কোনও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই সময়ে উল্লেখযোগ্য আর একটি বিষয় আছে, কহ্লনের শ্লোকগুলির যেমন দুটি করিয়া অর্থ আছে, কালিকামঙ্গলের কবিগণও যে পঞ্চাশিকা লিখিয়াছেন তাহারও দুইটি অর্থ আছে। বন্দী সুন্দর রাজাকে যে শ্লোকগুলি শুনাইয়াছিলেন তাহা মুখ্য অর্থে কালিকার স্তুতি হইলেও গৌণ অর্থে বিদ্যার রূপ গুণেরই স্তুতিবাদ।

নাথ-সাহিত্য

নাথ-সাহিত্য নামে প্রচলিত একশ্রেণীর কাব্যে নাথ-উপাধিধারী কতকগুলি ধর্মগুরুর মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। এগুলিকেও মঙ্গল-কাব্যের পর্যায়ে ফেলিতে হইবে ; কারণ মঙ্গলকাব্যের যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য—দেবতা অথবা দেবভাবসম্পন্ন মানুষের মাহাত্ম্য প্রচার—ইহাদেরও তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। অবশ্য এই শ্রেণীর কাব্য সংখ্যায় অধিক নহে। কিন্তু এই শাখার প্রচারিত কাহিনী এবং নাথ-ধর্ম, এই দুইটি বিষয়ই প্রণিধানযোগ্য।

নাথ-ধর্ম বলিতে নাথ-উপাধিধারী গুরুগণ যে ধর্ম প্রচার করিয়াছেন তাহাই বুঝায়। ধর্মটি বিচিত্র এবং বাংলা দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মই উহাকে এই বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।

আর্য-প্রভাব বিস্তারিত হইবার পূর্বে বাংলা দেশে কিরূপ ধর্মপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহা জানা যায় না, তবে অনেকে অনুমান করেন যে তখন শিব ও শক্তির একটা আদিম এবং অসংস্কৃত সংস্করণ প্রচলিত ছিল। পালরাজগণের অধিকারে আসিয়া বাংলাদেশ যেমন একটা রাষ্ট্রগত রূপ লাভ করিয়াছিল, তেমনই একটা সুসংস্কৃত ধর্মমতের আশ্রয়ে এক হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই ধর্ম বৌদ্ধধর্ম, কারণ পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে দুই প্রকার অনুষ্ঠান অনুসারে ক্রমে ইহাদের মধ্যেও দুইটি বিভাগ ঘটিয়াছে ; হীনযান ও মহাযান। হীনযান সম্প্রদায়ীরা সাংসারিক কর্তব্যকর্মাদির অনুশীলন পূর্বক স্বর্গ কামনায় সংযম-উপবাসাদির অনুষ্ঠান করে এবং মহাযান পন্থীরা সংসার ছাড়িয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরূপে নির্বাণ লাভ প্রত্যাশায় অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন ও ধ্যানযোগের অনুষ্ঠান করে।

পালরাজগণের পর যখন সেনরাজবংশ বঙ্গদেশ অধিকার করেন, তখন এদেশে

আবার হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু দেশের নবপ্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মমতকে অস্বীকার করার উপায় নাই, অথচ চিরাচরিত প্রাচীন ধর্মকেও সহজে পরিত্যাগ করা যায় না। কাজেই সাধারণের মধ্যে বুদ্ধদেবের চরিত্রকেই আশ্রয় করিয়া শিবের চরিত্র গঠন এবং তাঁহারই উপাসনা প্রচলিত হইল এবং যে তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি উভয় ধর্মসম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল তাহা অবলম্বনেই পরস্পরের পূজা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল।

শিবোপাসক এই শ্রেণীর যোগীদিগকে কন্‌ফট্-যোগীও বলা হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে এই সম্প্রদায়ের লোকদের দুই কর্ণে দুইটি বৃহৎ ছিদ্র থাকে (হিন্দী কণ=কর্ণ ; ফট=ফাটা বা ছিদ্র) ; ঐ ছিদ্র দুইটির মধ্যে একএকটি কুণ্ডল সন্নিবেশিত হয়, তাহা প্রস্তর, বেলোয়ার, বা গণ্ডারের শৃঙ্গে প্রস্তুত। ইহারা দীক্ষার সময়ে উহা গ্রহণ করে এবং উহাকে শিবের মণ্ডল বলিয়া বিশ্বাস করে। উহাকে মুদ্রা এবং দর্পণও বলে ; এইজন্য কন্‌ফট্ যোগীদিগকে দর্শনী-যোগীও বলা হয়। ঐ কুণ্ডল ছাড়া ইহারা তিন-অঙ্গুলি প্রমাণ একটি কৃষ্ণবর্ণ সামগ্রী একরূপ ঊর্ণ সূত্রের মালায় বন্ধন করিয়া গলদেশে ধারণ করেন। ঐ বস্তুটিকে নাদ বলে এবং যে সূত্রমালায় উহা গ্রথিত থাকে তাহা সেলি বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহারা শৈব ধর্মের সাধারণ নিয়ম অনুসারে গেরুয়া বস্ত্র পরিধান; মস্তকে জটা ধারণ, শরীরে ভস্মলেপন ও ললাটে বিভূতি দিয়া ত্রিপুণ্ড্র করিয়া থাকে।

যাঁহারা সর্বতোভাবে যোগসিদ্ধ হন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধযোগী বা সিদ্ধা বলে ; এইরূপ চুরাশিজন সিদ্ধার নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যোগীরা বলেন যে ইহারা ছাড়া আরও বহুব্যক্তি ঐরূপ যোগসিদ্ধ হইয়াছেন। সিদ্ধাগণ মহাযানমতাবলম্বী।

বৌদ্ধগান ও দোহার রচয়িতারূপে আমরা কয়েকজন সিদ্ধার পরিচয় পাইয়াছি সিদ্ধাগণ প্রাচীন হইলেও তাঁহাদের মঙ্গল-কাহিনীগুলি মোটেই প্রাচীন নহে ; ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত ইহাদের বিষয়ে প্রামাণ্য কোন পুঁথিই পাওয়া যায় নাই।

মঙ্গলকাব্যের আকারে যে সকল সিদ্ধযোগিগণের কীর্তি-কাহিনী এই শাখায় বর্ণিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনী এবং জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা ও রাজা গোবিন্দ-চন্দ্রের কাহিনী সমধিক প্রসিদ্ধ। মীননাথের কাহিনীতে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব-ব্যাপার কিছুই নাই ; কিন্তু হাড়িপা ও গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীতে বাস্তব জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার অন্ত নাই। এই গোবিন্দচন্দ্রকে রাজা রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়শিলালিপিতে বর্ণিত গোবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্ন প্রতিপাদন করিয়া মৈমনসিংহ জেলায় ধাড়িচন্দ্র-প্রবর্তিত বংশের অন্যতম নৃপতিরূপে প্রমাণিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রচলিত কাব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক

উপাদান যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে কিছুই জোর করিয়া বলা বলা যায় না ; ইহা যে কোনও বাস্তব নরপতির প্রকৃত জীবনকাহিনী সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবারও যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

মীননাথের কাহিনীতে পাওয়া যায় যে মহাদেব ক্ষীরোদ সাগরে টঙের উপর বসিয়া যখন গৌরীকে মহাজ্ঞানের পরমতত্ত্বসঙ্কেত বলিতেছিলেন, তখন মীননাথ মৎস্যরূপে টঙের নীচে থাকিয়া তাহা শুনিয়া লইলেন ; কিন্তু শেষে ধরা পড়িলে শিব অভিশাপ দিলেন যে তিনি এক সময়ে মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া যাইবেন। মহাদেব কৈলাসে ফিরিয়া গেলে চারিজন সিদ্ধা যোগপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাদেবের মুখে ইহাদের রিপুজয়ের খ্যাতি শুনিয়া গৌরী ইহাদের পরীক্ষা করিতে চহিলেন এবং গোরক্ষনাথ ব্যতীত সকলকেই অপদার্থ প্রমাণ করিলেন। কিন্তু বহুবার চেষ্টা করিয়াও গোরক্ষনাথকে কোনক্রমেই পরাজিত করিতে পারিলেন না ; গোরক্ষের হাতে তিনি বন্দী হইলেন। শেষে মহাদেবের আগমনে গৌরী মুক্তি পাইলেন। তখন মহাদেব এক কন্যাকে গোরক্ষের পত্নীত্ব বর দান করিলেন। গোরক্ষ তাহাকে গৃহে আনিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুর রূপ ধারণ করিলেন ; শেষে তাহার কাতরতা দেখিয়া পুত্রবর প্রদান করিয়া বকুলতলায় তপস্যা করিতে গেলেন।

গোরক্ষ বকুলতলায় বসিয়া দেখিলেন যে কানুপা আকাশ পথে চলিয়া যাইতেছে। তাঁহাকে অসম্মান করিতেছে ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গোরক্ষ নিজের একপাটি জুতাকে তাহাকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। কানুপা আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল যে, যে ব্যক্তি নিজ গুরুর হিতাহিত বিবেচনা করে না সে কোনও সম্মানের অধিকারী নহে ; গোরক্ষের গুরু মীননাথ কদলীর দেশে নারীর মোহে পড়িয়া জরাজীর্ণ ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার আয়ুর আর মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রহিয়াছে। গোরক্ষনাথ বলিলেন যে কানুপার গুরু হাড়িপাও অনুরূপ অবস্থায় রহিয়াছেন ; মেহারকুলের মহাজ্ঞানী রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ তাঁহাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। এইরূপে পরস্পরের গুরুর সংবাদ লাভ করিয়া উভয়েই গুরুর উদ্ধার সাধন করিতে গেলেন।

গোরক্ষনাথ ব্রাহ্মণবেশে কদলীতে গিয়া দেখিলেন যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার উপায় নাই। তখন তিনি যোগীর বেশে বায়ুপথে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং এক বকুলতলায় বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি স্ত্রীলোক সেখানকার পুকুর হইতে জল লইতে আসিলে গোরক্ষ তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে মীননাথ দুই পাটরাণী এবং ষোলশত সেবিকা পাইয়াছেন। সেখানে যোগীবেশে প্রবেশ করা অসম্ভব ; নর্তকী ভিন্ন কেহ মীননাথের সাক্ষাৎ পায় না।

গোরক্ষনাথ নর্তকীর বেশে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন এবং নৃত্যগীতের সময়ে মঙ্গলের সংকেতে গুরুকে পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিকে বিলাস-ব্যসনের ভোগসুখ, অন্যদিকে শিষ্য-প্রদর্শিত কৃচ্ছ সাধনের সংকল্প; মীননাথ আন্দোলিত হইলেন। শেষে গোরক্ষনাথ মহাজ্ঞান শুনাইলে তাঁহার চৈতন্য হইল। কদলীর নারীগণ গোরক্ষকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে তিনি তাহাদিগকে শাপ দিয়া বাদুড়ে পরিণত করিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং গুরু ও গুরুপুত্র বিন্দুনাথকে লইয়া বিজয়নগরে ফিরিয়া গেলেন।

হাড়িপা-গোপীচন্দ্রের কাহিনীতে পাই যে শিবের শাপে জালন্ধরিপাদ হাড়িপা বা হাড়িরূপে পাটিকা ভুবনে বা মেহাকুলে বাস করিতেছিল। রাজমাতা ময়নামতী সিদ্ধা ছিলেন; তিনি একদিন হাড়িপার মাহাত্ম্য দেখিয়া তাঁহাকে সিদ্ধাচার্য বলিয়া জানিতে পারেন এবং পুত্রকে তাঁহার নিকট দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক হন। গোবিন্দচন্দ্র তখন যুবক; সে অদুনা, পদুনা, প্রভৃতি 'ছয়কুড়ি' রানী লইয়া আনন্দে মত্ত। সে কিছুতেই সন্ন্যাস গ্রহণে এবং বিশেষ করিয়া এক হাড়ির নিকট দীক্ষা গ্রহণে স্বীকৃত হইবে না। বহু তর্ক-বিতর্ক এবং প্রমাণ-প্রয়োগের পর রাজা স্বীকৃত হইলেও রাণীদের মোহে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইল। ময়নামতী যোগবলে তাহার প্রাণ হরণ করিয়া শ্মশানে আবার যোগবলে তাহাকে বাঁচাইলেন এবং তাহাকে হাড়ির নিকট দীক্ষা লইতে স্বীকৃত করাইলেন।

হাড়িপা শিষ্যকে নগরে ভিক্ষা করিয়া আনিতে পাঠাইলেন; কিন্তু নিজে মায়াবলে গ্রামবাসিগণকে ভিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কোথাও ভিক্ষা না পাইয়া রাজা স্ত্রীর নিকটে গেলেন; সেখানেও বিফল হইয়া মাতার নিকটে গেলেন। ময়নামতী তাহাকে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিলে গুরুর কৃপায় তাহাদের সদুত্তর দিয়া রাজা কিছু ভিক্ষা পাইলেন, কিন্তু ফিরিবার পথে গুরুর মায়ায় তাহাও উড়িয়া গেল; রাজা রিক্তহস্তে গুরুর নিকট ফিরিলেন। তখন গুরু-শিষ্যে ভিক্ষার জন্য দেশান্তরে গেলেন এবং দক্ষিণদেশের সমুদ্রতীরে হীরা নামক এক বারাঙ্গনার নিকট চারকড়া কড়িতে শিষ্যকে বাঁধা রাখিয়া গুরু প্রস্থান করিলেন। এখানে রাজা ভৃত্যের কাজ করিতে লাগিল এবং হীরার প্রলোভনে মুগ্ধ হইল না বলিয়া নানাবিধ হীন এবং পরিশ্রমের কাজ করিতে বাধ্য হইল।

এইভাবে বার বৎসর কাটিলে অদুনা-পদুনা স্বামীবিরহে কাতর হইয়া শুক-সারীর অঙ্গে পত্র বাঁধিয়া দেশে দেশে পাঠাইল; তাহারা বহুস্থান ঘুরিয়া অবশেষে রাজার সন্ধান পাইয়া তাঁহার লিখন লইয়া ফিরিয়া গেল। বধূদ্বয় ময়নামতীকে ইহা জানাইলে তিনি মন্ত্রবলে গুরুকে জাগাইলেন এবং গুরু ও শিষ্যকে আনিবার

জন্য হীরার আলয়ে গেলেন।

এদিকে চরমুখে রাজার লিখনপ্রেরণের সংবাদ পাইয়া হীরা রাজাকে ভেড়া বানাইয়া শিকলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; কাজেই হাড়িপাকে সে বলিয়া দিল যে তাঁহার শিষ্য অনেকদিন পূর্বেই মরিয়া গিয়াছে। হাড়িপা ধ্যানবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া মন্ত্রবলে ভেড়ার শিকল ছিঁড়িয়া তাহাকে মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করাইলেন এবং মহাজ্ঞান দিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিলেন। কিন্তু শিষ্য যোগী হইতে চাহিলে পরদিবস তাহাকে মাথা মুড়াইয়া কর্ণে মুদ্রা পরাইয়া দিবেন বলিলেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজা পত্নীদিগকে নিজ যোগবিভূতি দেখাইতে লাগিলেন। গুরু ধ্যানযোগে ইহা জানিতে পারিয়া রাজার মহাজ্ঞান হরণ করিলে রাজা আর কিছুই দেখাইতে পারিলেন না। শেষে পত্নীগণের বিদ্রূপে হাড়িপার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিলেন।

এদিকে গোরক্ষনাথের নিকট সংবাদ পাইয়া কানুপা শিশুযোগীরূপে গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজধানীতে প্রবেশ করিলে কোটাল তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। কিন্তু রাণীর কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া কানুপা রাজার নিকটে গিয়া মন্ত্রবলে হাড়িপার ষোলশত শিষ্যকে সেখানে সমবেত করিল। রাজা বিস্মিত হইয়া তাহাদের আহার করাইতে গেলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের পেট ভরে না। শেষে কানুপার শরণাপন্ন হইলেন। কানুপা সেই সুযোগে গুরুর মুক্তি সাধন করিল এবং গোপীচন্দ্রও রাজ্য এবং পত্নীত্যাগ করিয়া যোগীবেশে গুরুর সহিত দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং এক বৎসর পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গোবিন্দচন্দ্র মহাজ্ঞান লাভ করিয়া অমর হইলে রাণী পরমসুখ লাভ করিলেন।

গোপীচন্দ্র রাজার কাহিনী সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল; বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ইহা বর্ণিত হইয়াছে এবং রাজার সন্ন্যাস গ্রহণের চিত্র অঙ্কিত হইয়া ইহার জনপ্রিয়তা প্রমাণিত করিতেছে।

এই সকল কাহিনী লইয়া অধিক কাব্যরচিত হয় নাই; কাজেই ইহাদের লেখক সংখ্যাও অল্প। বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত দুর্লভ মল্লিক রচিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত ভাষা ও কাহিনী বিবেচনায় প্রাচীনতম বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। দুর্লভের রচনা সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত; ইহাপেক্ষা গুণের কথা এই যে ঐ সকল কাহিনীতে যে নৈতিক অধোগতির পরিচয় পাওয়া যায়, দুর্লভ তাহার আভাষমাত্রও নাই। গ্রন্থে কবির আত্ম-পরিচয় বা গ্রন্থরচনার কাল নাই বলিয়া সে বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।

ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত ভবানীদাসের পাঁচালী ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেও গ্রন্থকার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

স্থকুর মামুদের পাঁচালীও প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতেও গ্রন্থকার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নাই।

রংপুর জেলায় প্রাপ্ত পাঁচালীও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তবে ইহার সহিত ভবানীদাসের রচনার সাদৃশ্য এত অধিক যে ইহাও তাঁহারই রচনা বলিয়া মনে হয়।

মীনচেতন ও গোরক্ষ বিজয় দুই নামের কালিনী যথাক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও মুনসী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; ইহারা একই গ্রন্থ। তবে বিভিন্ন পুঁথিতে রচয়িতার ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকায় ইহাদের প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

এই শাখার কাব্যকে একেবারেই উচ্চাঙ্গের বলা যায় না; বিশেষ করিয়া ইহা যদি দেশের প্রকৃত সমাজ চিত্র হয়, তাহা হইলে দেশের নৈতিক অধোগতি অতি নিদারুণ হইয়াছিল বলিতে হইবে।

বিবিধ মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী

মঙ্গলকাব্যের প্রচার ও জনপ্রিয়তা দেখিয়া সকল ভক্তই নিজ নিজ আরাধ্য দেব-দেবীর মঙ্গলকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল; তাই প্রায় সকল দেব-দেবীরই মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহাদের সকলের জনপ্রিয়তা সমান নহে; তাহার কারণ এই যে শ্রেষ্ঠ কবিদের হাতে পড়িয়া মঙ্গলকাব্য এমন একটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল যে, আসলে কবি না হইলেও এরূপ একটি কাব্য রচনা করা আর আয়াস-সাধ্য রহিল না; যে কেহ ইচ্ছা করিলেই একটি মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে পারিত। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক এই যে, উৎসাহী পর্যটক দেবদেবীর মাহাত্ম্যের পাশে তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিল, এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।

সর্পভয়ভীত মানুষ যেমন মনসাদেবীর পূজা আরম্ভ করে, সেইরূপ বসন্ত রোগাক্রান্ত মানুষ প্রদাহ যন্ত্রণা হইতে দেহকে শীতল করিবার জন্য শীতলাদেবীর পূজা প্রবর্তন করে। মনসাদেবীর ন্যায় শীতলাও অনার্য-সমাজের লৌকিক দেবতা। ইহার কাহিনীও মঙ্গলকাব্যের ছায়ায় রচিত হইয়াছে; শিবভক্তকে অসংখ্য

নির্যাতন করিয়া দেবী পূজা আদায় করিলেন।

শীতলার মাহাত্ম্য প্রচারক চারিটি কাহিনী পাওয়া গিয়াছে; ইহারা ভিন্ন ভিন্ন কবি-কর্তৃক রচিত বলিয়া মনে হয় যে, এগুলি এক-একটি স্বতন্ত্র কাব্য। গোকুল পালায় কৃষ্ণবলরামের বসন্ত রোগ শীতলার পূজা করিয়া সারিয়াছিল। বিরাটপালায় বিরাটরাজ্যে বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিলে শীতলা পূজায় রোগের উপশম হয়। চন্দ্রকেতুর পালাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

চন্দ্রকেতুর পালায় শিব-ভক্ত রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্যে নিজ পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে শীতলাদেবী অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটাইলেও রাজা শীতলার পূজা করিলেন না। দেবীর কোপে তাঁহার উনসত্তর পুত্র একে একে বসন্তে মরিল; কনিষ্ঠ পুত্রবধূ চন্দ্রকলা স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণে যাইতে প্রস্তুত হইলে শীতলার কৃপায় মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বামীর জীবন ফিরাইয়া আনিল এবং গৃহে আসিয়া উনসত্তর জন ভাসুরকে পুনরায় বাঁচাইল। তথাপি চন্দ্রকেতু শীতলার পূজা করিলেন না; তখন মহাদেব স্বয়ং আসিয়া তাহাকে শীতলা পূজা করিতে আদেশ দিলেন। চন্দ্রকেতু বাধ্য হইয়া শীতলার পূজা করিল এবং মৃত ব্যক্তিদের প্রাণ ফিরিয়া পাইল।

এইভাবে দেশে শীতলা পূজা প্রচলিত হইল।

কাঁটাদিয়া নিবাসী নিত্যানন্দ চক্রবর্তীকেই এই শাখার আদি কবি বলা হইয়া থাকে। ইহার কাব্যে রচনাকাল নাই; অনেকে তাঁহাকে ১৭ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। এই শাখার অন্য কবি দৈবকীনন্দ সম্ভবতঃ ১৮শ শতাব্দীর লোক। তাঁহার কাব্যে ৬৮ প্রকার বসন্তের নাম প্রকার এবং প্রতিকারের উপায় বর্ণিত হইয়াছে! আরও কয়েকজনের নাম শুনা যায় বটে, তবে কাব্য পাওয়া যায় নাই।

এই শাখার রচয়িতাগণ কেহই প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন; মনসামঙ্গলের বেহুলা কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে কাব্য রচনা করায় তাঁহারা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই।

দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চলে ব্যাঘ্র এবং কুম্ভীরের ভয়ে স্থানীয় জনসাধারণ দক্ষিণরায় এবং কালুরায়ের পূজা করিয়া থাকে। দক্ষিণরায়ের কাহিনীতে বড় খাঁ গাজী এবং বনবিবির উল্লেখে ইহা হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ-ভাবে প্রচলিত হইয়াছে।

দক্ষিণরায়ের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলকে অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছে। বড়দহের সদানার দেবদত্ত তুরঙ্গ শহরে বাণিজ্যযাত্রা করিয়া রাজদহে সমুদ্রমধ্যে এক চরে

লক্ষ্মীনারায়ণকে উপবিষ্ট হইয়া 'হরিণ, মহিষ, মানুষ, বাঘ' খাইতে দেখিলেন এব তুরঙ্গের সুরথরাজাকে তাহা বর্ণনা করিলেন। কিন্তু রাজাকে তাহা দেখাইতে না পারিয়া কারাগারে বন্দী হইলেন।

দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার সংবাদ বহুদিন না পাইয়া নিজেই তুরঙ্গে যাইতে মনস্থ করিল এবং রতাইকে নৌকা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিল। রতাই ছয় ভ্রাতাকে লইয়া বনে কাঠ কাটিতে গিয়া দক্ষিণরায়ের প্রিয় গাছটি কাটিয়া ফেলিল। অনুচরমুখে তাহা শুনিয়া দক্ষিণরায় ছয়টি বাঘ পাঠাইলেন ; তাহারা রতাইএর ছয় ভাইকে খাইয়া ফেলিল। রতাই ভ্রাতৃশোকে আত্মহত্যা করিতে গেলে দক্ষিণরায়ের দৈববাণী শুনিয়া সেইস্থানে দেবতার পূজা করিয়া নিজ পুত্রকে বলি দিল। তখন দক্ষিণরায় আবির্ভূত হইয়া তাহার পুত্র এবং ভ্রাতৃগণকে পুনরায় বাঁচাইয়া দিলেন। তাহারা কাঠ লইয়া দেশে ফিরিল।

মহাদেবের আদেশে হনুমান ও বিশ্বকর্মা সাতখান ডিঙা গড়িয়া জলে ভাসাইয়া দিল এবং পুষ্পদত্তকে স্বপ্নে আপন আপন পরিচয় দিয়া চলিয়া গেল। পুষ্পদত্ত পরদিন সেই দৈব ডিঙার পূজা করিয়া তাহাতে উঠিয়া পিতার অন্বেষণে যাত্রা করিল। খনিয়া-নামক স্থানে আসিয়া বড় খাঁ গাজী ও দক্ষিণরায়ের বিবাদ-বৃত্তান্ত এবং ভগবানের অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ পয়গম্বর বেশে আবির্ভাব ও বিরোধের অবসান ঘটানোর কাহিনী শুনিল। সমুদ্রমধ্যে রায়ের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পুষ্পদত্ত অবশেষে তুরঙ্গ শহরে উপস্থিত হইল।

পরবর্তী কবিগণ মাধবাচার্যকেই রায়মঙ্গলের আদি কবির সম্মান দিয়াছেন ; এই মাধবাচার্য সম্ভবতঃ চণ্ডীমঙ্গলের কবি। কালিকামঙ্গলের নিমতা নিবাসী কবি কৃষ্ণরাম এই শাখার অন্যতম কবি।

মুন্সী বয়নুদদীন সাহেব 'বনবিবি জহুরানামা' নামে রায়মঙ্গলের এক আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাব্যে দক্ষিণরায়ের সহিত বনবিবির বিরোধ এবং অবশেষে জেন্দা গাজী বা বড়গাজীর মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে।

রায়মঙ্গল কাব্যের কাব্যগুণ একেবারেই নাই ; কিন্তু ইহাতে কাহিনীর বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং মীমাংসার একটা চিত্র ইহাতে পাওয়া যায়। এইরূপ দেবতার পূজা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই করিয়া ছিল বলিয়া দেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠারও যথেষ্ট সুবিধা হইতেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গার পৃথক্ সত্তা উপলব্ধি করিয়া দুর্গামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে ; অবশ্য ইহার মধ্যে লৌকিক বা মৌলিক কাহিনী নাই ;

প্রায় সমস্তই মার্কণ্ডের চণ্ডীর ভাবানুবাদ। ১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল এই শ্রেণীর একখানি কাব্য; ইহাতে রামচন্দ্রের অকাল বোধনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকাবিজয় এবং রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুর্গামঙ্গল বৃহদাকার কাব্য; ইহার পালা দুই ভাগে বিভক্ত :—(১) গৌরীবিলাস ও কঙ্কালীর অভিশাপ; (২) নলদময়ন্তী। গৌরীবিলাস মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুভাবে লিখিত এবং নলদময়ন্তী শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিত অবলম্বনে রচিত। রামচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে কবি ছিলেন, ইহা তাঁহার রচনা পড়িলে মনে হয়।

লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য প্রচারক কাহিনীকে দুইভাগে ভাগ করা যায় :—পাঁচালি ও ব্রতকথা। প্রথম শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে গুণরাজখাঁ শিবানন্দ কর রচিত লক্ষ্মীমঙ্গল বা কমলামঙ্গল কাব্য প্রাচীনতম। ব্রতকথার মধ্যে বসন্ত, ধনঞ্জয়, যাদবদাস, কিঙ্কর, জগমোহন মিত্র, রঞ্জিত রামদাস, ভরত পণ্ডিত, মহেশচন্দ্র দাস, বিপ্র যাদবানন্দ প্রভৃতির রচনা পাওয়া গিয়াছে।

সূর্যের মাহাত্ম্য প্রচারক মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণের মধ্যে রামজীবন বিদ্যাভূষণের ও দ্বিজ কালিদাসের সূর্যের পাঁচালী উল্লেখযোগ্য। চাটিগ্রামের লক্ষ্মণ কবির কাব্যও ও প্রচলিত ছিল।

সরস্বতীর মাহাত্ম্য-প্রচারক সারদামঙ্গল কাব্য কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। দয়ারাম এবং দ্বিজ বীরেশ্বরের কাব্যই ইহাদের মধ্যে অধিক প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ মহাকবি কালিদাসের বর লাভের কাহিনী বর্ণনা করিয়া ভারতী-মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র সেনের সারদামঙ্গলে রামায়ণের কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

কালিকামঙ্গল এবং রায়মঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম ষষ্ঠীমঙ্গলের আদি কবি। তাঁহার কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে যে ষষ্ঠীদেবী নিজ পূজা আদায় করিতে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে সপ্তগ্রামের রাজা শত্রুজিতের রাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া ষষ্ঠীপূজার মাহাত্ম্য বিবৃত করিলেন। ষষ্ঠীর বরে সায়বেণের স্ত্রী সাত পুত্র লাভ করিয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী একদিন ষষ্ঠীর নৈবেদ্য খাইয়া ফেলিয়া শাশুড়ীকে বলিল যে একটি কাল বিড়ালে উহা খাইয়া গিয়াছে। কাল বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন। এই বধূ পুত্র সন্তান প্রসব করিলে কাল বিড়ালে তাহা অপহরণ করিল; এইভাবে ছয়টি পুত্র অপহৃত হইলে বধূ বনে গিয়া প্রসব করিল এবং পুত্রকে কোলে লইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু সেখানে তাহার একটু তন্দ্রাবেশ হইলেই বিড়ালে পুনরায় শিশু অপহরণ করিল। বধূ জাগিয়া উঠিয়াই বিড়ালের পিছনে ছুটিল, কিন্তু হুচোট খাইয়া পড়িয়া গিয়া

কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে দেবীর দয়া হইলে তাহার সম্মুখে তিনি আবির্ভূতা হইলেন এবং সব পুত্র ফিরাইয়া দিলেন। রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর ষষ্ঠীকামঙ্গল এই শাখার বৃহত্তম কাব্য। ইহাতে তিনটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ঃ—(১) ষষ্ঠী ও কাতিকেয়ের জন্ম, তারকাসুর বধ, কাতিকেয়ের তীর্থভ্রমণ ও বিবাহে অসম্মতি; এগুলি সমস্তই পৌরাণিক কাহিনী। (২) কোলাঞ্চ দেশের রাজ্যচ্যুত রাজা ক্ষেত্রমিশ্রের প্রতি দেবীর অনুগ্রহে পুত্রলাভ এবং পুত্রকর্তৃক পিতৃরাজ্য উদ্ধার। (৩) কলাবতীর কাহিনী।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আর একটি দেবতার মাহাত্ম্য-কাহিনী বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের লোক কিছুকাল পাশাপাশি বাস করিয়া তাহারা উভয়ের মধ্যে একটা সৌহার্দ্দ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং উভয় সম্প্রদায়ের সহজ গ্রাহ্য একটা ধর্মমত বা দেবার্চনা প্রচলনের চেষ্টা করিতে থাকে। তাই হিন্দুর দেবতার সহিত মুসলমানের পীরের মিলনাত্মক কাহিনী প্রচারিত এবং তাহা অবলম্বনে কাব্য রচিত হইতে থাকে। রায়মঙ্গল-কাব্যেও এরূপ প্রচেষ্টার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে ইহা যেরূপ ব্যাপক এবং অধিক প্রচলিত হইয়াছিল এরূপ আর কোনও হয় নাই।

সত্যপীরের কাহিনীর প্রথম অংশে বর্ণিত হইয়াছে যে ভগবান শ্রীহরি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপর কৃপা করিয়া মুসলমান ফকিরের বেশে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাহাকে সিন্নি (ফারসী-শিরীণী [শীর-মিষ্ট-চিনি]) সহযোগে পূজা করিতে বলেন, ইহাতে ব্রাহ্মণ ধনরত্ন লাভ করে। কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হইয়াছে যে এক সদাগর সত্যনারায়ণের কৃপায় কন্যালাভ করে এবং তাহার বিবাহ দিয়া জামাতাকে লইয়া বাণিজ্য যাত্রা করে; কিন্তু সত্যনারায়ণের পূজা না করায় পথে বিপদ হয় ও পত্নীর পূজার ফলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে। সদাগর গৃহে ফিরিলে তাহার কন্যা সত্যনারায়ণের প্রসাদ অবজ্ঞা করিয়া স্বামীর নিকট ছুটিলে ঘাটে নৌকা ডুবিয়া যায়। তখন পুনরায় সত্যনারায়ণের পূজা করায় নৌকাসুদ্ধ সকলে জল হইতে উঠিয়া পড়ে।

ভৈরবচন্দ্র ঘটকই সত্যপীরের পাঁচালির প্রাচীনতম কবি; ইনি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন। দ্বিজ রামকৃষ্ণ, বিকল চট্ট, দ্বিজ রামভদ্র, অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র, কবি বল্লভ, দ্বিজ গিরিধর, কৃষ্ণকান্ত, শিবচন্দ্র সেন, রামশঙ্কর সেন, দ্বিজ কৃপারাম, কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, দ্বিজ জনার্দন ছাড়াও অসংখ্য কবি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বসিয়া সত্যপীরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। শিবায়ণের কবি রামেশ্বরই এই শাখার শ্রেষ্ঠ পাঁচালিকার; কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রও একটি পাঁচালি রচনা করিয়াছিলেন।

ধর্মনৈতিক কারণে ভারতবর্ষের কয়েকটি তীর্থস্থান বাঙালীর নিকট প্রাধান্য লাভ করিলে তাহাদের মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্যও রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল কাব্যে গঙ্গাযোগে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে গঙ্গার উভয় তীরস্থ গ্রামের বর্ণনা রহিয়াছে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীখণ্ড নামক কাব্য রচনা করিয়া তাহাতে কাশীর বিবরণ দিয়াছেন।

এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াই অনেক কাব্য রচিত হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে বাস করার জন্য ঐ স্থান যে প্রাধান্য লাভ করে তাহার ফলে পুরীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া অসংখ্য কাব্য রচিত হয়। দ্বিজ মাধবের একটি গঙ্গামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মাধবাচার্য রচিত গঙ্গামঙ্গল কাব্যে বিষ্ণুর পদে গঙ্গার জন্মলাভ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও সৌদাস রাজার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দ্বিজ গৌরাঙ্গ, জয়রাম, দ্বিজ কমলাকান্ত, শঙ্করাচার্য প্রভৃতির ছোট ছোট কাব্য পাওয়া গিয়াছে। দুর্গাপ্রসাদ মুখটির 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী'ই এ শাখার শ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহাতে কাহিনীর নূতনত্ব এবং বর্ণনায় কবিত্ব পাওয়া যায়।

পুরীর মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্যগুলির মধ্যে মহাভারতকার কাশীরামের ভ্রাতা গদাধরের জগন্নাথ মঙ্গলই প্রাচীনতম; ইহা স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ডকে অনুসরণ করিয়া লিখিত। দ্বিজ মুকুন্দের জগন্নাথবিজয়, দ্বিজ দয়ারামের জগন্নাথ মাহাত্ম্য, বিশ্বম্ভর দাসের জগন্নাথমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল কাব্যের রচনা কাল অধিকাংশক্ষেত্রে জানা যায় না। এগুলি ধর্মগত কারণেই প্রচলিত, কাব্যাংশে অধিকাংশগুলিই নিতান্ত অচল।

মহাভারত

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান॥

মহাভারতের কাহিনীকে অমৃতের ন্যায় সুধাময় পবিত্র ও মৃত-সঞ্জীবনী ঘোষণা করিয়া এবং শ্রোতামাত্রকেই পুণ্যের অধিকারী বলিয়া কবি কাশীরাম দাস কিছুমাত্র অত্যুক্তি অথবা অহংকার প্রকাশ করেন নাই; কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের ও রসবস্তুর যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন মাত্র। সংস্কৃত মহাভারতে ব্যাসদেব প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের একটি অধ্যায় চিত্রিত করিয়াছেন; বীরত্ব, ন্যায়ধর্ম, পাপ-পুণ্যের একটা সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার করিয়াছেন। আর বাঙালী কবিগণ

বাঙালীর শিক্ষা এবং ধর্মসাধনার যতকিছু আদর্শ ও অনুকরণীয় আছে, তাহা সমস্তই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাই প্রবাদে আছে যে, 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে' ; মহাভারতে যাহা উল্লিখিত হয় নাই তাহার অস্তিত্ব ভারতবর্ষে নাই।

বাংলা মহাভারতগুলি ব্যাসদেব বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ। কিন্তু অন্যান্য অনুবাদের ক্ষেত্রে যেরূপ ঘটিয়াছে, মহাভারতেও তদনুরূপ কবি স্বাধীনতার সহিত পরিবর্তন, পরিবর্জন এবং নূতন উৎপাদন সংযোজন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে অনুবাদ অপেক্ষা বরং মৌলিক কাব্য বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদ হইয়াছিল হোসেন শাহের রাজত্বকালে। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ চট্টগ্রামে যুদ্ধ করিতে গিয়া সেখানেই বসবাস স্থাপন করেন এবং হিন্দুদিগের এই কাব্য শুনিতে ইচ্ছা করিয়া কবীন্দ্রকে ইহা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিতে আদেশ দেন। রাজকার্য সম্পাদনে অনেক সময় লাগিত বলিয়া তিনি অতি সংক্ষেপে মহাভারত রচনা করিতে বলেন ; তাই কবীন্দ্রের কাব্য মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সার। কাব্য হইতে রচনা কাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে, হোসেন শাহ ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালে রচিত কাব্য ১৬শ শতাব্দীর মধ্যেই হইয়াছিল বলিতে হইবে।

কবীন্দ্র সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না ; তবে একটু জানা গিয়াছে যে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে তাঁহার নাম ছিল পরমেশ্বর, কিন্তু ইহা অজ্ঞ লিপিকরদের প্রমাদে সৃষ্ট হইয়াছে। আসলে কবি ভণিতায় "কবীন্দ্র পরম যত্নে" লিখিয়াছিলেন এবং তাহাই লিপিকরদের হাতে পড়িয়া "কবীন্দ্র পরমেশ্বরে" পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ কাব্যের নাম "পাণ্ডব বিজয় কথা" ও "বিজয় পাণ্ডব কথা" লিপিকরদের ভ্রান্ত পাঠে "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত" নামে প্রচারিত এবং কিছুকাল পূর্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন।

পরাগলের পুত্র ছুটিখানের আদেশে শ্রীকর বা শ্রীকরণ নন্দী মহাভারতের আর একটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীকর ও কবীন্দ্র এক ব্যক্তি নহেন এবং শ্রীকর কবীন্দ্রের কাব্য সম্পূর্ণও করেন নাই, তিনি পৃথক কাব্য লিখিয়াছিলেন। এরূপ উক্তির প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে কবীন্দ্র জৈমিনীকে এবং শ্রীকর সঞ্জয়কে (বৈশম্পায়ন) আদর্শ করিয়া কাব্য রচনা করেন। শ্রীকরের কাব্যের ভণিতায় উল্লিখিত সঞ্জয়ের নাম দেখিয়া অনেকে আবার সঞ্জয় নামে আর একটি কবির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত রামচন্দ্রখান এবং দ্বিজ রঘুনাথের 'অশ্বমেধ' পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে।

মহাভারতের প্রসিদ্ধতম কবি কাশীরাম দাস বর্ধমান জেলায় সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনুমানিক ১৬০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিবিধ বিরুদ্ধ প্রবাদ থাকা সত্ত্বেও কাশীরাম যে সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা একরূপ নিশ্চিত।

অন্যান্য কাব্যের ন্যায় কাশীরামের কাব্যেও যথেষ্ট প্রক্ষেপ রহিয়াছে। কিন্তু এই কাব্যের পুঁথি অনেক পাওয়া যাইতেছে বলিয়া প্রকৃত পাঠ নির্ধারণে বিশেষ কষ্ট হইবে না। প্রচলিত মহাভারত গ্রন্থের মধ্যেও কাশীরামকে পাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না এবং পাঠকমাত্রেই তাঁহাকে বাঙালীর জাতীয় কবি বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন না। কাশীরাম ভক্ত কবি; তাঁহার গ্রন্থে একাধারে ভক্তি এবং কাব্যরস পাওয়া যায়। তাই কাশীদাসী মহাভারত যেমন ধর্মপিপাসুর হৃদয় দ্রবীভূত করে, তেমনি কাব্যরসিকদের চিত্ত অধিকার করে।

নিত্যানন্দ ঘোষ নামক মহাভারত রচয়িতা এক কবিকে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।

বিশারদ রচিত 'বন' ও 'বিরাট পর্বের' সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিরাট পর্ব রচনার কাল ১৬১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্বিজ হরিদাসের একখণ্ড 'অশ্বমেধ পর্ব' পাওয়া গিয়াছে। রচনাকাল নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

১৬৯৯-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কৃষ্ণানন্দের 'শান্তিপর্ব' এবং তৎপুত্র অনন্ত রচিত 'অশ্বমেধ পর্ব' পাওয়া গিয়াছে।

ঘনশ্যাম দাসের 'ভারত-পাঁচালি' কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকার বা রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই জানা যায় নাই।

কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ আনুমানিক ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে আদি, বিরাট, ভীষ্ম ও দ্রোণ পর্ব রচনা করেন; অন্য কোন পর্ব রচনা করেন কিনা জানা যায় না, কারণ আর কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

প্রাণনারায়ণের সভাকবি দ্বিজ রামেশ্বরও একখণ্ড 'ভারত পাচালি' রচনা করেন।

চন্দনদাস দত্ত প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া একটী কাব্য রচনা করেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি কবিচন্দ্র দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেবের

পুত্র—মল্লরাজ প্রথম গোপাল সিংহদেবের আদেশে ১৭১২—৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহাভারত কাব্য রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু কবি মহাভারতের পর্ববিশেষ অথবা কাহিনীবিশেষ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে বাসুদেব রচিত স্বর্গারোহণ পর্ব, গোপীনাথ দত্ত রচিত দ্রোণ ও নারী পর্ব, রামনারায়ণ ঘোষ রচিত নলোপাখ্যান, রাজেন্দ্র দাস রচিত শকুন্তলা উপাখ্যান, লোকনাথ দত্ত রচিত নলদময়ন্তী উপাখ্যান, রাজারাম দত্ত রচিত দণ্ডীপর্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।